সীরাতুল হাবীব

[নবী (ﷺ)-এর জীবনী]

السيـرة العطرة

للحـبـيـب المصطفى ﷺ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

সূচীপত্র

প্রকাশকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

সীরাতুল হাবীব তথা নবী [ﷺ]-এর জীবনী যার মহৎ আদর্শ ও অনুপম দৃষ্টান্ত ছাড়া কেউ নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের উজ্জ্বল জীবন গড়তে পারে না। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য সীরাতের কিতাবসমূহ হতে **"সীরাতুল হাবীব"**-এর উপর এই ছোট বইটি সবার জন্য উপহার দিচ্ছি।

বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো চোখে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে তা যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১৪/০৭/১৪৩৪হিঃ
২৪/০৫/২০১৩ইং

ভূমিকা

সকল প্রসংশা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি তাঁর হাবীব [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বিশ্ববাসীর জন্য মহান আদর্শ ও অনুপম দৃষ্টান্ত এবং রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানব ও শান্তির দূত মুহাম্মদ [ﷺ], তাঁর পরিবার, মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবীদের উপর।

আমাদের কারো অজানা নেই যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্ব নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মহান সীরাতের (জীবনীর) মধ্যে মুসলিম এবং অমুসলিম সবজাতির জন্য সুমহান আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বিক জীবন ব্যবস্থা রয়েছে।

মুসলিম উম্মার ঐক্যের এক অনন্য সোপান হলো: মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নির্দেশিত সেই সুউজ্জ্বল পথ যার রাত-দিন সমান। এ থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম অবশ্যই ধ্বংস। অতএব, ইসলামের সুপথপ্রাপ্ত প্রত্যেকের সামনে এমন একটি চমৎকার ও উত্তম আদর্শ থাকা দরকার, যা তার চলার পথকে আলোকিত করবে এবং তার উপর সে অটল থাকবে। আর এর উপর ভিত্তি করলে তাঁর সকল কাজ আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া হেদায়েত ও সরল সঠিক পন্থায় হবে।

প্রতিটি মুসলিমকে মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সীরাত (জীবনী-Lifi his:ory) জানা একান্ত জরুরি কর্তব্য। মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সীরাত একটি ব্যাপক বিষয় যার বিস্তারিত আলোচনা করা এ ছোট পুস্তকে সম্ভব নয়।

তাই তাঁর সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়ের আলোচনা এখানে করা হলো যাতে ক'রে প্রত্যেকে মহানবী [সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরিচিতি লাভ করে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে জীবনকে ধন্য করতে পারে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তোমার প্রিয় হাবীবের জীবনাদর্শকে সর্বজীবনে বাস্তবায় করে তাঁর সঙ্গে রোজ হাশরে এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকার তওফিক দান করুন।

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১৪/০৭/১৪৩৪হিঃ
২৪/০৫/২০১৩ইং

* জাহেলিয়াতের অন্ধকার
* জন্ম ও শৈশবকাল
* হস্তী ও বিমান বাহিনী
* হার্ট অপারেশন
* শান্তির নীড়

জাহেলিয়াতের যুগ

(ক) ধর্মীয় অবস্থাঃ

ইসলামের পূর্বে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল বড় নাজুক। মূর্তিপূজা ছিল বহুল প্রচলিত একটি ধর্ম। সঠিক দ্বীন পরিপন্থী মূর্তিপূজার মত বর্বরতাকে ধর্ম বানিয়ে নেওয়ার কারণে তাদের ঐ যুগকে "জাহিলি যুগ" বলা হয়ে থাকে। এ সময় প্রত্যেক গোত্রের একটি করে বিশেষ মূর্তি ছিল। তাদের প্রসিদ্ধ দেবতাসমূহের মধ্যেঃ লাত, উজ্জা, মানাত, হুবল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ছোট ছোট মূর্তি ছিল অসংখ্য যা তারা সফরে সঙ্গে এবং বাড়িতে রাখত। তবে আরবদের মধ্যে সে যুগে কিছু ইহুদি, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকও ছিল। আর তাদের মধ্যে কিছু এমন মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যারা মিল্লাতে ইবরাহিম বা সঠিক দ্বীনের উপর অটল ছিল।

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্তকে জাহিলি যুগ বলা হয়। সে যুগে পশু সম্পদ ছিল আরব বেদুঈনদের প্রধান নির্ভর। আর শহরবাসীরা নির্ভর করত কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। সে সময়ে তাদের বেশ কিছু আবাদি এলাকা ছিল। আর মক্কা ছিল তখনকার আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও প্রধান বাণিজ্যিক নগরী। শিল্প ও কলকারখানা বলে কোন জিনিস ছিল না তাদের।

(গ) সামাজিক অবস্থাঃ

পরস্পরে জুলুম ও অত্যাচার ছিল তাদের আসল সামাজিক রূপ। দুর্বলের কোন অধিকার ছিল না। মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হত। মানহানি করা ছিল খুবই সহজ

ব্যাপার। অধিক স্ত্রী গ্রহণ ও তালাকের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না।

নারীদের কোন অধিকার ছিল না। তাদেরকে ঘরের আসবাব পত্রের ন্যায় মনে করা হত। বাবার অন্য স্ত্রীকে বড় ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করত। এমনকি বাবার মৃত্যুর পরে বড় ছেলে বাবার অন্যান্য স্ত্রীকে বিবাহ করার অধিকার রাখত। তাছাড়াও জেনা-ব্যভিচার ছিল ব্যাপক হারে। আর ছোট-খাট বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাহাজানি ও হামলা করা ছিল দৈনন্দিনের কাজ। আর মূর্খতা ছিল ব্যাপক হারে বিস্তৃত।

(ঘ) চারিত্রিক অবস্থাঃ

আরবদের চারিত্রিক অবক্ষয় চরম অবস্থায় পৌঁছে ছিল। মদ পান, জুয়া খেলা, হানাহানি, ছিনতাই, জুলুম-অত্যাচার ও খুনাখুনি, লুট-তরাজ, চুরি-ডাকাতি, এতিমের মাল ভক্ষণ, সুদ, জেনা ইত্যাদি ছিল মহামারির মত। তবে তাদের মাঝে ছিল কিছু ভাল জিনিস। যেমনঃ মেহমানদারী, দান-খয়রাত, বাহাদুরী এবং কুটিলতা মুক্ত অন্তর। তারা অঙ্গিকার ভঙ্গ করত না এবং সুস্পষ্টবাদী ও সত্যবাদী ছিল।

(ঙ) রাজনৈতিক অবস্থাঃ

আরব উপদ্বীপের লোকেরা শহুরে ও গ্রাম্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গোত্রীয় নিয়ম-নীতি দ্বারা তাদের বিচারাচার হত। গোত্র প্রধানরাই ছিল সমাজ পরিচালনার কর্তা ও মাতব্বর। আপোষের মাঝে ছোট-ঘাট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল অতি সহজ ব্যাপার।

জন্ম ও শৈশবকাল

+ নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুর্‌রাহ ইবনে কা'আব ইবনে লু'য় ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র ইবনে মালিক ইবনে আন্‌নায্‌র ইবনে কেনানাহ ইবনে খুজাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নেজার ইবনে মা'আদ ইবনে 'আদনান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম [عليه السلام] আল-কুরাইশী আল-হাশেমী।

+ **উপনামঃ** বড় ছেলের নাম দ্বারা উপনাম রাখা আরবদের একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল এবং ইহা ইসলামেরও নিয়ম। তাই মহানবী [ﷺ] তাঁর বড় ছেলে কাসেম-এর নামে উপনাম ছিল **আবুল কাসেম**।
+ **মার নামঃ** আমেনা বিন্তে ওয়াহাব ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে জুহরা ইবনে কিলাব।
+ **বাবাকে না দেখতেই এতিম হলেনঃ**

মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মা আমেনার গর্ভে তিন মাসের সন্তান তখনই পিতা আব্দুল্লাহ একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। ফিরার পথে মদিনায় অসুস্থ হয়ে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জন্মের পূর্বেই সন্তান মুহাম্মদকে এতিম করে চিরতরে বিদায় নেন। আর তাই তিনি বাবাকে না দেখতেই হলেন এতিম।

+ মীলাদুন্নবী ও প্রতিপালনঃ

"মীলাদ" শব্দটি আরবি যার আভিধানিক অর্থ জন্মের সময়। [কামূস:১/২১৫] "মীলাদুন্নবী" অর্থ নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মকাল।

+ নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মঃ

(ক) বছরঃ

কোন বছরে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্ম হয় এ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে যেমনঃ

F আবরাহার হাতির বছর। এ মতটিই সাধারণত অধিক প্রসিদ্ধ।

F হাতির বছরের ১০ বছর পর।

F হাতির বছরের ১৫ বছর পর।

F হাতির বছরের ২৩ বছর পর।

F হাতির বছরের ৩০ বছর পর।

F হাতির বছরের ৪০ বছর পর।

হাতির ঘটনার কতদিন পর তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে যেমনঃ

@ ৩০ দিন পর।

@ ৪০ দিন পর।

@ ৫৫ দিন পর।

@ ৫০ দিন পর। এ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

(খ) মাসঃ

কোন মাসে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্ম তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। যেমন:

@ সফর মাস।
@ রবিউল আওয়াল মাস। এ মতটিই সাধারণত বেশি প্রসিদ্ধ।
@ রবিউস সানি মাস।
@ রজব মাস।
@ রমজান মাস।

(গ) জন্মদিন:

নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মদিন সোমবার এ ব্যাপারে সকলেই একমত; কারণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আমি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমার উপর অহি নাজিল হয়েছে।" [মুসলিম]

(ঘ) তারিখ:

তারিখ নিয়েও অনেক মতভেদ রয়েছে। যেমন:

ð ১ রবিউল আওয়াল।
ð ২ রবিউল আওয়াল।
ð ৮ রবিউল আওয়াল।
ð ৯ রবিউল আওয়াল। এ মতটিই অধিকাংশ বিদ্বান ও বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ মাহমূদ পাশার অভিমত।
ð ১০ রবিউল আওয়াল।
ð ১২ রবিউল আওয়াল। এ মতটি জনগণের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ।
ð ১৩ রবিউল আওয়াল।

ð ১৭ রবিউল আওয়াল।

ð ১৮ রবিউল আওয়াল।

(ঙ) জন্মক্ষণঃ

এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যেমনঃ

Â দিনে।

Â রাত্রে।

Â ফজরের সময় ৪টা ২০মিঃ। এ মতটি বেশি প্রসিদ্ধ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মের সন, মাস, তারিখ ও জন্মক্ষণ সবকিছুতেই মতভেদ রয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা আসেনি। শুধুমাত্র দিনের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কারণ, ইহা সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বর্তমানে যেমন হাজার হাজার বছরের সামনের ক্যালেন্ডার বানানো সম্ভব। অনুরূপ পেছনের ক্যালেন্ডার বানিয়ে ঐতিহাসিকগণ ও কনষ্টান্টিনোপলের বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ মাহমূদ পাশা প্রমাণ করেছেন যে, ৫৭১ খৃষ্টাব্দের রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ কোন ভাবেই সোমবার হয় না। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, নবী [দ:]-এর জন্ম রবউিল আওয়াল মাসের ৯ তারিখ ১২ তারিখ নয়।

অতএব, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মঃ হাতির ঘটনার ৫০ দিন পর, রবিউল আওয়াল মাসের ৯

তারিখ, রোজ সোমবার, ভোর ৪টা ২০ মি: পবিত্র মক্কাতে। আর ইংরেজী সাল হিসাবে হয় ২২শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।[১]

+ নামকরণ ও আকীকা:

শিশু মুহাম্মদের প্রসবকালে মা আমেনা কোন প্রকার ব্যথা উপলদ্ধি করেননি, যা অন্যান্য নারীরা করে থাকেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা আমেনা দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট নাতি আগমনের সুসংবাদটি পাঠালেন। তিনি প্রফুল্লচিত্তে এসে তাঁকে নিয়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করেন ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন। আর আরবদের প্রথা অনুসারে ৭ম দিনে তাঁর আকীকা করে নাম রাখেন "মুহাম্মদ" যার অর্থ প্রশংসিত। এ নাম ইতিপূর্বে আরবদের নিকট পরিচিত ছিল না এবং খাৎনাও করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে মা আমেনা তাঁর সন্তানের নাম রাখেন "আহমাদ"-এর অর্থও প্রশংসিত।

+ ইবনুল যাবীহাতাইন:

দাদা আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে জমজম কূপ খনন করার জন্য আদিষ্ট হন। কূপ প্রকাশ পেলে কুরাইশরা এ মহৎ কাজে শরিক হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। এ সময় তিনি মানত মানেন যে, আল্লাহ যদি তাকে দশটি ছেলে সন্তান দান করেন, যারা কুরাইশদের মোকাবেলায় তাঁকে সাহায্য করবে, তাহলে একজনকে কা'বার পার্শ্বে কুরবানি করবেন। আশা পূরণ হয় আব্দুল মুত্তালিবের। তাই কুরবানির জন্য লটারী করে নাম

---

[১]. রাহমাতুললিল আলামীন ও আর-রাহীকুম মাখতূম

নির্বাচন করলে বারবার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান আব্দুল্লাহ-এর নাম আসে।

সবার পরামর্শে কুরবানি না করে তার পরিবর্তে উট কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নেন। ১০টি উট ও আব্দুল্লাহর মাঝে লটারী করলে প্রতিবার আব্দুল্লাহর নামই উঠে। এভাবে দশ দশটি ক'রে উট প্রতিবার লটারীতে বাড়ানো হলে পরিশেষে দশম বারের লটারীতে একশত উটে গিয়ে আব্দুল্লাহর বিনিময় উটের লটারী বের হয়। ফলে আব্দুল মুত্তালিব সন্তান আব্দুল্লাহ-এর পরিবর্তে একশত উটই কুরবানি করেন। আর এ জন্যেই আব্দুল্লাহকে দ্বিতীয় যাবীহুল্লাহ বলা হয়।

অনুরূপ রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রথম যাবীহ ইসমাঈল (আ:)-এর বংশধর। তাঁকে তাঁর পিতা ইবরাহিম (আ:) আল্লাহর নির্দেশে স্বপ্নে কুরবানি করতে দেখে মিনার প্রান্তে কুরবানি করতে উদ্যত হলে আল্লাহ তা'য়ালা একটি দুম্বার বিনিময়ে তাঁকে ফেরৎ দেন। আর এ জন্যে ইসমাঈল (আ:)কে যাবীহুল্লাহ্ বলা হয়।

+ বিমানবাহিনী দ্বারা হস্তীবাহিনী ধ্বংসঃ

ইয়ামেনের গভর্নর "আব্রাহা" মানুষকে মক্কার ক'াবা ঘরের হজ্ব করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ইয়ামেনের বর্তমান রাজধানী সান'আয় এক বিশাল গির্জা তৈরী করে। এ খবর জেনে আরবদের বনি কিনানার এক ব্যক্তি রাত্রি বেলায় গির্জায় প্রবেশ করে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে নোংরা করে চলে আসে। আবরাহা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ বাহিনীতে ৯টি হাতি ছিল, এর মধ্য হতে সবচেয়ে বড়টি বেছে নিয়েছিল সে তার

নিজের জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেন।
[সূরা ফীলের তফসীর দ্রষ্টব্য]

আরবদের দিন, তারিখ ও বছর গণনার কোন প্রকার পুঞ্জিকা ছিল না। বড় কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের বিভিন্ন জিনিসের হিসাব রাখত। যেমনটি অশিক্ষিত মানুষের মাঝে এ ধরণের প্রথা আজও চালু আছে। যদি তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় দাদী তোর ছেলের বয়স কত? সে বলবে: ঐ বড় বন্যা বা বাংলাদেশ স্বাধীনের এক বছর আগে বা পরে জন্ম।

আরবদের নিকটে হাতির বছর ছিল এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। একে কেন্দ্র করে তারা অনেক কিছুর হিসাব রাখত। তাই রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্ম তারিখ বলা হয়েছে হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে। কিন্তু কখন ছিল এ ঘটনা তার কোন দিন তারিখ ও বছর উল্লেখ নেই। আর নবীর জন্ম তারিখ উম্মতের জানা জরুরি হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বা তাঁর নবী আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন।

+ দুধ মা হালীমা সা'দিয়ার ক্রোড়ে:

আরবদের প্রথা অনুযায়ী জন্মগ্রহণের পর শিশুদেরকে দুধ পানের জন্য শহর থেকে দূরে গ্রাম্য পরিবেশে পাঠানো হতো; কারণ এতে অকৃত্রিম জীবন গঠনে ও নিরাপদে শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হত। ঠিক এমন একটি সময়ে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জন্মগ্রহণের পরে বনি সা'দ বিন বক্‌র গোত্রের একটি ধাত্রীদল গ্রাম থেকে শিশুদের নেওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে আসে। তাদের প্রত্যেকেই মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে গরিব ও এতিম জেনে প্রত্যাখ্যান করে।

সকলে একটি করে শিশু পেলেও হালীমার ভাগ্যে কেউ জুটে না। একেবারে খালি হাতে ঘরে না ফিরে আমেনার কোলের এতিম শিশুটিকেই কম মজুরিতে হলেও নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কারণ এতে করে কষ্টের জীবন যাপনে কিছুটা হলেও সহযোগিতা হবে। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সেই বছরটিতে।

হালীমা সা'দীয়া তার স্বামীর সাথে মক্কায় আসার সময় একটি দুর্বল উষ্ট্রির উপর আরোহণ ক'রে এসেছিলেন, যা অতি ধীরে ধীরে চলত। কিন্তু ফিরার পথে যখন মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার কোলে তখন তাদের উষ্ট্রি অতি দ্রুত এবং সবার আগে চলতে লাগল। এ অবস্থা দেখে সবাই অবাক হলো।

হালীমা সা'দীয়া আরো বর্ণনা করেন: তার বুকের স্তনে পূর্বে তেমন কোন দুধ না থাকায় তার শিশুটি সর্বদা ক্ষুধায় কান্না-কাটি করত। কিন্তু যখন থেকে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্তনে মুখ লাগিয়েছেন তখন থেকেই প্রচুর দুধ আসা শুরু করেছে।

তিনি আরো বর্ণনা করেন: বনি সা'দ গোত্রে তখন খরা-অনাবাদী এবং দুর্ভিক্ষ ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসার পর তাদের জমিনে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদিপশু বাড়তে শুরু করে। এভাবে চারিদিক থেকে বরকত শুরু হওয়ায় তাদের সার্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তাদের অভাব-অনটন দূর হয়ে যায়। তারা সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকেন।

মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হালীমা সা'দীয়ার যত্নে ও সংরক্ষণে ২ বৎসর থাকলেন। এরপর হালীমা সা'দীয়া তাঁকে মক্কায় তাঁর মা এবং দাদার নিকট নিয়ে আসলেন। কিন্তু

মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বাড়ীতে অবস্থানকালে যে সকল বরকত হালীমা দেখেছেন, সে জন্যে আবার তাঁকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে মা আমেনা তা মেনে নিলেন। তাই ফিরে আসলেন হালীমা সা'দীয়া বনি সা'দ গোত্রে সেই এতিম শিশুটিকে নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত। তিনি খুশীতে বাগবাগ হলেন এবং আবারো তাকে ঘিরে নিলো চারিদিক থেকে সৌভাগ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

+ হার্ট অপারেশনঃ

মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বয়স যখন চার বছর। তিনি কোন এক দিন তাঁর দুধ ভাইয়ের সাথে তাঁবু থেকে দূরবর্তীতে খেলাধুলা করতে ছিলেন। হঠাৎ ক'রে দুধ ভাই দৌড়ে আসল মা হালীমার কাছে। চেহারায় আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা সহকারে মাকে বলল: মা আমার কুরাইশী ভাইকে বাঁচাও। তিনি ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে বলল: সাদা কাপড় পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে আমাদের মধ্যে হতে তাঁকে নিয়ে গেল এবং শুইয়ে দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করল। কথা শেষ করতে না করতেই হালীমা ছুটে গেলেন মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দিকে। গিয়ে দেখলেন তিনি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন কোন প্রকার নড়াচড়া করছেন না ও চেহারা ফ্যাকাশে। তিনি দু:খভরে তাঁর দুর্ঘটনা জানতে চাইলে উত্তরে বললেন: আমি ভাল আছি এবং বর্ণনা করেন যে, সাদা পোশাকে দু'ব্যক্তি এসে আমাকে নিয়ে যায় ও বুক বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ড (কল্‌ব) বের ক'রে উহা হতে কালো রক্তপিণ্ড ফেলে দেয়। অত:পর সুশীতল জম্‌জমের পানি দিয়ে হৃদয় ধুয়ে ফেলে বুকের মধ্যে পূর্বস্থানে তা রেখে দেয়। তারপর বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে তারা স্থান ত্যাগ ক'রে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হালীমা এরপর তাঁকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসলেন। পরের দিন সকালে হালীমা মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে নিয়ে মক্কায় মা আমেনার কাছে গেলেন। দ্বিতীয় বারের মত অনেক পীড়াপীড়ি ক'রে নিয়ে গিয়ে অসময়ে হালীমার এ আগমনে মা অবাক হয়ে গেলেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি ঘটনা খুলে বললেন।

- হালীমা ছাড়াও যারা তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেনঃ চাচা আবু লাহাবের আজাদকৃত দাসী সুওয়াইবা। তিনিই সর্বপ্রথম দুধ পান করিয়ে ছিলেন। আর বাবা আব্দুল্লাহ এর দাসী উম্মে আইমান (বারাকা) হাবশিয়া সর্বপ্রথম তাঁর আয়া ছিলেন।

+ প্রিয় হাবীব [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মা আমেনাকেও হারালেনঃ

আমেনা স্বামীর স্মরণে ইয়াছরিবে (মদীনায়) তার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হন। সঙ্গে ছিলেন এতিম ছেলে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং দাসী উম্মে আইমান ও পথ প্রদর্শক হিসাবে আব্দুল মুত্তালিব। সেখানে তিনি এক মাস অবস্থানের পর ফিরার পথে মক্কা ও মদীনার মাঝে "আব্‌ওয়া" নামক স্থানে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে পূর্ণ এতিম বানিয়ে পরকালে পাড়ি দেন। সে স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মা-বাবা দুই জনকে হারিয়ে পূর্ণ এতিম হয়ে গেলেন।

+ স্নেহশীল দাদার প্রতিপালনেঃ

দাদা আব্দুল মুত্তালিব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর যে কোন শূন্যতা পূরণে অগ্রগণ্য

ভূমিকা পালন করতেন। তাই তাঁকে ছেলের মত স্নেহে লালন-পালন এবং ভরণ-পোষণ করতেন। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো: তাঁর বয়স যখন মাত্র ৮ বৎসর ২ মাস ১০ দিন তখন দাদাও এ দুনিয়া ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমালেন।

+ সহানুভূতিশীল চাচার জিম্মাদারীতে:

মৃত্যুর পূর্বেই দাদা মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে তাঁর চাচা আবু তালিবের হাতে উঠিয়ে দিয়ে যান। চাচার বড় পরিবার ও স্বল্প আয়ের অস্বচ্ছল সংসার হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেন। ঠিক সেভাবে তাঁর চাচী আম্মারও অবদান কম ছিল না। এ এতিম সন্তানটির সম্পর্ক ছিল তাঁর চাচার সাথে অতি গভীর। আর তাই তিনি তার ছত্র ছায়ায় সততা ও আমানতদারীর উপর এমনভাবে গড়ে উঠেন যে, সততা তাঁর বিশেষ উপাধিতে পরিণত হয়। এর ফলে কুরাইশরা **"আল-আমীন"** উপাধি দ্বারা তাঁকে ভূষিত করে এবং এ নামেই তিনি সবার কাছে এক বাক্যে পরিচিত হন।

+ শান্তির নীড়:

স্বনির্ভর হওয়ার জন্য জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট হলেন মক্কার এতিম ছেলেটি। এবার শুরু হলো তাঁর কর্ম জীবনের পালা। কিছু অর্থের বিনিময়ে কুরাইশদের ছাগল চরানোর মধ্যদিয়ে শুরু করলেন তার কর্ম অভিযান।

সততার সুনাম মক্কার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর মক্কার ধনকুবের মালিক খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ আল-কুরাইশীয়্যাও জানতে পারলেন। শামে (সিরিয়ায়) ব্যবসার উদ্দেশ্যে "মাইসারাহ" নামক তার কৃতদাসকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করলেন আর সঙ্গে আল-আমীনকে। মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আমানতদারী ও সততার বরকতে খাদীজার শামের বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হলো, যা এর পূর্বে কখনো হয়নি।

খাদীজা মাইসারার নিকট থেকে অধিক লাভের কারণ জেনে বড় খুশী হলেন। আগেই তিনি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাপারে অনেকটা অবহিত ছিলেন। সব মিলে আল-আমীনের ব্যাপারে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁকে জীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ ক'রে বিধবার একাকী জীবনকে দম্পত্তি জীবনে পদার্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

খাদীজা বান্ধবী নাফীসা বিন্তে মুনাইয়াহকে ঘটকী করে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। এ সময় মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর আর খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] চাচাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হল। ধন্য হলেন সৌভাগ্যবান ও বুদ্ধিমতী খাদীজা। আর চরম সুখী হলেন নবদম্পতি এবং এক পরম শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠিত হলো। এবার মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খাদীজার সয়-সম্পতির সুষ্ঠ পরিচালনা যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দিতে লাগলেন।
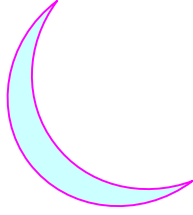
+ নুবুয়াত ও রিসালাত

+ দা'ওয়াতের কৌশল

+ বিপদের সময় দৃঢ়তা

+ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্

+ ইসলামের আলোর ঝলক

নবুয়াত ও রিসালাত

@ প্রিয় হাবীব [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জাবালে নূরের হেরা গুহায়ঃ

সারা বিশ্ব শিরক, কুফর, অপসংস্কৃতি ও নির্যাতনের অমানিশা অন্ধকারে নিমজ্জিত। ঠিক এমন সময় পথহারা, দিশাহারা মানুষকে আলোর পথ দেখাবার জন্য যে মহামানব সবসময় চিন্তা-ভাবনা করতেন তিনি হলেন রাহমাতুল লিল'আলামীন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বৎসরের কাছা-কাছি তখন থেকেই মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর হেরা গুহার (তায়েফের রাস্তার পার্শ্বে মক্কার নিকটবর্তী পাহড়ের উপরে একটি গুহা) নির্জনতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। কখনও কখনও সেখানে একাধারে কয়েক দিন-রাত কাটিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি একদিন হেরা গুহায় অবস্থানরত ছিলেন। এটি ছিল ২১শে রমজানের রাত্রি সোমবার মোতাবেক ১০ই আগষ্ট ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ। তখন মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বয়স চন্দ্র বছর হিসাবে ৪০ বৎসর ৬ মাস ১২দিন এবং সৌর বৎসর হিসাবে প্রায় ৩৯ বৎসর ৩মাস ২০দিন।

ঠিক এমন সময়ে সর্বপ্রথম অহি নিয়ে আসলেন জিব্রীল আমীন (আঃ) এবং মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে সম্বোধন ক'রে বললেনঃ পড়ুন, তিনি বললেনঃ আমি পড়তে জানি না। তিনি বলেনঃ এরপর ফেরেশতা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জোরে চাপ দিলেন, তাতে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়লাম। এভাবে জিব্রীল-(আঃ) তিনবার পুনরাবৃতি করার পর তৃতীয়বারে বললেনঃ "পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা অতি ক্ষমাশীল। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" [সূরা আলাক:১-৫]

অত:পর জিব্‌রীল (আ:) চলে গেলেন। এ দিকে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হেরা গুহা থেকে দ্রুত খাদীজা (রা:)-এর কাছে চলে আসেন। তাঁর হৃদয় ভয়ে কাঁপতে ছিল। তিনি বললেন: "আমাকে বস্ত্রাবৃত ক'রে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত ক'রে দাও।

এরপর তারা তাঁকে বস্ত্রাবৃত করলেন এবং তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সকল খবর জানিয়ে খাদীজা (রা:)কে বললেন: আমি আমার জীবনের আশঙ্কা বোধ করছি। শুনে খাদীজা (রা:) বললেন: অসম্ভব, আপনাকে কখনো আল্লাহ তা'আলা অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেন। বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করেন। মেহমানদারী ও সত্যের উপর বিপদ-আপদে সহায়তা করেন।

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি এবাদত করার জন্য হেরা গুহায় ফিরে যান এবং রমজান মাসের বাকি দিনগুলো পুরা করেন। রমজান শেষে তিনি যখন মক্কাভিমূখে আসতে ছিলেন এবং "বাত্বনে ওয়াদী" নামক স্থানে এসে পৌঁছালেন তখন তাঁর নিকট জিব্‌রীল (আ:) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এমন একটি আসনে বসা অবস্থায় ছিলেন যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অত:পর নাজিল হলো: "হে চাদরাবৃতকারী, উঠুন, সতর্ক করুন। আপনার পালনকর্তার মহত্ব ঘোষণা করুন। আর নাপাক থেকে

দূরে থাকুন।” [সূরা মুদ্দাস্‌সির:১-৪]। এরপর থেকে অবিরাম অহি নাজিল হতে শুরু হয়।

দা'ওয়াত ও তাবলীগ

@ নবী-রসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য:

১. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।
২. সর্বপ্রকার শিরকের মূলোৎপাটন করা।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

N M L K J I H G F E D [

النحل: ٣٦ Z b

“আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য) থেকে বেঁচে থাক।” [সূরা নাহাল:৩৬]

দা'ওয়াত ও তাবলীগ ছিল মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নবুয়াত ও রিসালাতের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দা'ওয়াতের কাজ দুইভাবে করেন। **(এক)** গোপনে। **(দুই)** প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে দা'ওয়াত ও তবলীগ ছিল আবার দুইভাবে। এক: মক্কার ভিতরে, দুই: মক্কার বাইরে। মক্কার বাইরে আবার ছিল দুই প্রকার: এক: আরব উপদ্বীপের ভিতরে ও দুই: আরব উপদ্বীপের বাহিরে।

@ গোপনে দা'ওয়াত:

সূরা মুদ্দাস্‌সির নাজিল হওয়ার পরে নবী [ﷺ] আল্লাহর দ্বীনের দিকে ইসলামের দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ শুরু করেন। তিন বৎসর পর্যন্ত মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] গোপনে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। যে নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁর সাহাবীগণ সম্মিলিত হতেন সেখানেই তাঁর দা'ওয়াত সিমাবদ্ধ থাকত। বাহিরে কোথাও প্রকাশ করতেন না। এভাবে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর ইসলামের ব্যাপারটি গোপন রাখতেন; কারণ কোনভাবে কারো ব্যাপারে জানাজানি হয়ে গেলে তাঁকে ইসলাম থেকে বিমূখ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন করা হত। নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম ব্যক্তিদের সর্বপ্রথম দা'ওয়াত করাটাই ছিল প্রথম কাজ।

@ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় যাঁরা সর্বপ্রথমঃ

১. মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দা'ওয়াতের শুরুতেই ঈমানের ডাকে সর্বপ্রথম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সাড়া দিলেন তাঁর গুণবতী সহধর্মিণী খাদীজা (রাঃ)। আর এ মহাগৌরব অর্জন করলেন একজন নারী কোন পুরুষ নয়।

২. এরপর বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর চাচাত ভাই আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)। তাকে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের তত্বাবধানে রাখতেন এবং তার ভরণ-পোষণ করতেন।

৩. এরপর দাস-দাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের আজাদকৃত দাস জায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)। তিনি ছিলেন খাদীজা (রাঃ)-এর গোলাম। খাদীজা (রাঃ) জায়েদকে মহানবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য দান করেছিলেন।

৪. এরপর পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বক্‌র (রা:)।

@ সর্বপ্রথম মুসলিম পরিবার ও তার সদস্যগণ:

ইসলামের সর্বপ্রথম মুসলিম পরিবার হলো নবী [ﷺ]-এর পরিবার। এই সেই প্রথম বাড়ি যেখানে হেরা গুহার পরে প্রথম অহি পাঠ হয়েছিল। যে বাড়িতে সর্বপ্রথম নামাজ কায়েম হয়েছিল। যার সদস্যদের তিনজন সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত। যাঁরা ছোট-বড় সকলেই ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য অঙ্গীকার করে কখনো পিছ পা হননি। সদস্যগণ হলেন: মহানবী [ﷺ], স্ত্রী খাদীজা (রা:) নবীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত আলী ইবনে আবি তালিব, [رضي الله عنه] আজাদকৃত গোলাম জায়েদ ইবনে হারেসাহ [رضي الله عنه] এবং চার কন্যা যথাক্রমে: জাইনাব, উম্মে কুলসূম, রোকাইয়া ও ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)।

@সর্বপ্রথম ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা:

এ সকল নিপীড়ন ও নির্যাতনের কারণে কাজ-কর্মে তাঁরা ইসলামের বহি:প্রকাশ করতে পারতেন না। অবস্থা সাপেক্ষে গোপনীয়তা ছিল সে সময়ের দা'ওয়াত ও তবলীগের এক জরুরি কৌশল। তাই তাঁরা গোপনে সমবেত হতেন। কেননা, প্রকাশ্যে সম্মিলিত হলে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্যান্য ইসলামি কার্য-কলাপে নি:সন্দেহে তাঁরা কাফেরদের কর্তৃক বাধাপাপ্ত হতেন। আর ইহা কখনো কখনো উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের কারণও হয়ে দাঁড়াত। আর এ ধরণের যুদ্ধ তখনকার কম সক্তি ও দুর্বল সরঞ্জাম

সম্পন্ন অল্প সংখ্যক মুসলিমদের একেবারে বিনাশ ক'রে দিত। সুতরাং, গোপনীয়তাই ছিল হিকমত তথা সুকৌশল।

তাই রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] "সাফা" পাহাড়ের উপরে "আরকাম বিন আবিল আরকাম"-এর বাড়িকে দা'ওয়াত ও তবলীগের জন্য সর্বপ্রথম ইসলামিক সেন্টার হিসাবে নির্বাচন করেন।

. এ বাড়িটি বির্বাচনের কারণ ছিল গোপন ও নিরাপত্ত্বাঃ

প্রথমতঃ তখনো আরকামের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটা গোপন ছিল; তাই সেখানে একত্রিত হওয়ার বিষয়টা কাফেরদের অন্তরে না আসারই কথা।

দ্বিতীয়তঃ আরকাম ছিলেন বনি মাখজুম গোত্রের, যারা ছিল নবী [ﷺ]-এর গোত্র বনি হাশেমের চির শত্রু। তাই তার ঘরে মুহাম্মদের যাওয়া আসাটা কারো চিন্তায় না পড়ার কথা।

তৃতীয়তঃ আরকাম ছিলেন অল্প বয়ষের মাত্র ১৬ বছরের যুবক। তাই কাফেররা যখন ইসলামিক সেন্টারের তালাশ করবে তখন এমন একজন ছোট বয়ষের যুবকের বাড়ি তাদের মাথায় খেলবে না। বরং তারা বনি হাশেম অথবা আবু বকর কিংবা অন্যান্যদের বাড়ি তালাশ করবে।

. দা'ওয়াতের প্রোগ্রাম সূচী ছিল নিম্নরূপঃ

১. একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা এবং সর্বপ্রকার মূর্তিপূজা ও শিরক ত্যাগ করা।
২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করা।
৩. উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।
৪. সর্বপ্রকার হারাম জিনিস পানাহার করা থেকে বিরত থাকা।

৫. জেনা-ব্যাভিচার ও সকল প্রকার নোংরা ও অশ্লীল থেকে বিরত থাকা।

@প্রকাশ্যে দা‘ওয়াত:

তিন বৎসর এভাবে গোপনে দা‘ওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাজিল করলেন।

[O P Q R Z الشعراء: ٢١٤

“আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক করুন।” [সূরা শু‘আরা:২১৪]

[. / 0 1 2 3 4 Z الحجر: ٩٤

“অতএব, যা আপনাকে বলা হয়েছে তা প্রকাশ্যে করতে থাকুন এবং মুশরিকদের কোন পরোয়া করবেন না।”

[সূরা হিজ্‌র: ৯৪]

অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একদা “সাফা” পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরাইশদের ডাক দিলেন। ডাক শুনে অনেকেই জমায়েত হলো। এদের মধ্যে ছিল রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আপন চাচা আবু লাহাবও। এ ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা রাখত। জমায়েত হওয়ার পর নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে সম্বোধন ক’রে বললেন: “যদি আমি বলি এই পাহাড়ের পশ্চাতে একদল শত্রু আপনাদের হামলার অপেক্ষায় আছে, তাহলে কি আপনারা বিশ্বাস করবে? সবাই বলল: হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। কারণ, আপনাকে আমরা সর্বদা আল-আমীন তথা সত্যবাদী হিসাবে পেয়েছি।

অত:পর তিনি বললেন: তাহলে শুনুন! আমি আপনাদেরকে এক ভয়াবহ আজাবের ব্যাপারে সাবধান করছি। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করলেন এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বললেন।

কথা শুনে চাচা আবু লাহাব ধমক দিয়ে বলল: তুমি ধ্বংস হও! তুমি আমাদেরকে এ কথা বলার জন্য ডেকেছ? আবু লাহাবের এ কথার পর আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব (মাসাদ) নাজিল করেন।

এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ প্রকাশ্যে চালিয়ে যেতে লাগলেন। লোকজনের সম্মিলিত স্থানে প্রকাশ্যে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। কা'বার পার্শ্বেও সালাত আদায় করতে আরম্ভ করলেন।

@ আল্লাহর আলো নিভানোর জন্যঃ

কাফের-মুশরেকরা ইসলামের আলোকে নিভানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের পন্থা অবলম্বন করে তার মধ্যেঃ

১. মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে সাহায্য করা থেকে আবু তালিবকে বিরত রাখার জন্য বহু অপচেষ্টা।
২. বিভিন্ন প্রকার জুলুম-নির্যাতন।
৩. সত্য দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।
৪. ঠাট্টা-বিদ্রুপ।
৫. নাচ-গান ও নর্তকী নিয়োগ।
৬. কুরআনের পরিবর্তে বিভিন্ন কেসসা-কাহিনীর প্রচার-প্রসার।
৭. নিষ্ঠুর বয়কট-অবরোধ।
৮. বিভিন্ন ধরণের নোংরা অপবাদ।
৯. হত্যার ষড়যন্ত্র।

@ জুলুম ও অত্যাচারঃ

নবুয়াতের ৪র্থ বর্ষের শুরুতে যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত শুরু হয়, তখন কাফেররা এ দা'ওয়াত বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। পরিশেষে তারা নির্যাতন ও নিপিড়নের কুচক্রান্ত করল; যাতে করে নও মুসলিমরা ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়। অত:পর প্রত্যেক নেতারা তাদের নিজ নিজ গোত্রের যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন তাঁদেরকে এবং মুনীবরা নিজস্ব দাস-দাসীদেরকে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন শুরু করল। তাই কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার বেড়েই চলল।

@ নির্যাতনের কিছু চিত্রঃ

(ক) নবী [ﷺ]-এর প্রতি নির্যাতনঃ

মক্কার কাফের-মুশরেকরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে নির্যাতন করতে কিছু কম করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের বহু আয়াতে তাঁর প্রিয় হাবীবকে ধৈর্যধারণ এবং দুশ্চিন্তা না করার জন্য নির্দেশ ও সান্তনা দান করেন। যেমনঃ

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

المزمل: ١٠ Z d c b a ` _ ^] [

"কাফেররা যা বলে, সে জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।" [সূরা মুজ্জাম্মিল:১০]

আল্লাহ তা'য়ার আরো বাণীঃ

النمل: ٧٠ Z ﴿٧٠﴾ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ~ } | { z y [

"তাদের কারণে আপনি দু:খিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মন:ক্ষুণ্ন হবেন না।" [সূরা নামাল:৭০]

আল্লাহ তা'য়ার আরো বাণীঃ

لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ~ } | { z y x w v u t s r [

أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ Z فصلت: ٤٣

"আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ:৪৩]

নবী [ﷺ] যে সকল নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তার কিছু উদাহরণঃ

১. এ উম্মতের ফেরাউন আবু জাহল বললঃ মুহাম্মদ তোমাদের সামনে কা'বা ঘরের পার্শ্বে সেজদা করে? লোকেরা বললঃ হ্যাঁ, তখন সে বললঃ যদি আমি তাকে সেজদা করতে দেখি তাহলে তার ঘাড়ের উপর পা দ্বারা পদদলিত করব অথবা তার চেহারা মাটিতে ধূষরিত করব। এরপর একদিন নবী [ﷺ] কা'বার পার্শ্বে নামাজ আদায় করতেছিলেন। আবু জাহল তাঁর ঘাড় পদদলিত করার জন্য নিকটে যাওয়ার সাথে সাথে পেছনের দিকে সরে আসে এবং তার দুই হাত দ্বারা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে থাকে। তাকে বলা হলো কি হলো ব্যাপারটা কী? সে বললঃ আমার এবং মুহাম্মদের মাঝে এক আগুনের পরিখা, বিভিষিকা অবস্থা ও ডানা বিশিষ্ট কি যেন? পরে নবী [ﷺ] বলেনঃ সে যদি আমার নিকটে আসত, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলত। [মুসলিম]

২. নবী [ﷺ] কা'বার পার্শ্বে নামাজ আদায় করতে ছিলেন। এ দেখে আবু জাহল বলে উঠল কে আছ মুহাম্মদ যখন সেজদা করবে তখন তার উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেবে? এ কথা শুনে সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি 'উকবা ইবনে আবু মু'ঈত উঠে একটি উটের ভুঁড়ি নিয়ে এসে রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন সেজদরত তখন তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখে দিল। আর ওরা একে অপরের গায়ের উপর পড়ে পড়ে সবাই মজা করে হাসতে থাকল। এ অবস্থা দেখে একজন দাসী প্রিয় হাবীবের মেয়ে ফাতেমা (রা:)কে খবর দিলে তিনি দৌড়ে এসে বাবার কাঁধ থেকে উটের ভুঁড়ি সরিয়ে ফেলেন। নবী [ﷺ] নামাজ

শেষে এক এক করে নাম ধরে তাদের প্রতি বদদোয়া করেন। বদদোয়া শুনে তারা ভয় পায়। কারণ, মক্কা দোয়া কবুলের স্থান। [বুখারী ও মুসলিম এবং ড: যিয়া উমারীর-সহীহ সীরাহ নুববীয়্যা:১/১৪৯]

৩. একদা হিজরে ইসমাঈলে কাফেরদের সরদাররা একত্রি হয়। তারা বলে: মুহাম্মদের ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্যধারণ করছি তা অন্যান্যদের জন্য করছি না। সে আমাদের যুবকদের বোকা বানাচ্ছে এবং আমাদের দেবতাগুলোকে গালি-গালাজ করছে। আমরা তার বিষয়ে বড় ধৈর্য ধরেছি আর নয়। এ সময় নবী [ﷺ] তাদের দিকে আগমন করেন। দেখে তারা মৌমাছির মত সকলেই একই সাথে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। আর বলতে থাকে: তুমি এমন এমন কথা বল, আমাদের দ্বীন ও দেবতাদেরকে মন্দ বল। উত্তরে তিনি [ﷺ] বলেন: হ্যাঁ, আমি এরূপ কথা বলি। অত:পর একজন তাঁর চাদর ধরে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করলে আবু বকর [رضي الله عنه] কাঁদতে কাঁদতে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেন: তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে বলে: আমার প্রতিপালক আল্লাহ। [ইবরাহিম আল-আলীর সহীহ সীরাত নববী:পৃ ৯৬]

৪. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল তাঁকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। তারা চোগলখোরী করে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। উম্মে জামীল নবী [ﷺ]-এর রাস্তায় কাঁটা দিয়ে এবং বাড়ির দরজার সামনে ময়লা ফেলে রেখে কষ্ট দিত। তাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে নাজিল হয় সূরা লাহাব (মাসাদ)। উম্মে জামীল এ সূরা নাজিলের সংবাদ শুনে

রাগান্বিত হয়ে কা'বার পার্শ্বে আসে। এ সময় নবী [ﷺ] সেখানে বসে ছিলেন, সাথে ছিলেন আবু বকর [رضي الله عنه]। সে তার হাতে এক মুষ্ঠি কংকর নিয়ে তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে বলেঃ আবু বকর! তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পেরেছি যে, সে আমার দুর্নাম করে। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে পেতাম তাহলে এ কংকরগুলো তার মুখে ছুড়ে মারতাম। এ বলে সে চলে যায়। অত:পর আবু বকর [رضي الله عنه] বলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ওকে দেখেননি সে আপনাকে তালাশ করতেছিল। নবী [ﷺ] বলেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা তার দৃষ্টি আমার থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। [বুখারী]

৫. কুরাইশদের শেষ সিদ্ধান্ত ছিল তাঁকে হত্যার, যা পরে আসবে। কোন সাহাবী (রা:) কাফেরদের নির্যাতনের স্বীকার হওয়ার পূর্বে তিনিই [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নির্যাতিত হন। তিনি বলেনঃ আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমি যে আতঙ্কীত হয়েছি সেরূপ আর কেউ হয়নি। আর আল্লাহর জন্য যেরূপ নির্যাতিত হয়েছি সেরূপ আর কেউ হয়নি। আমার উপর এমন ৩০ দিন-রাত অতিবাহিত হয়েছে যখন আমার ও বেলালের খাওয়ার জন্য আত্মাবিশিষ্ট কোন জীবের উপযুক্ত খাদ্য ছিল না। কেবলমাত্র ছিল বেলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখার মত অল্প কিছু জিনিস। [হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী, হাঃ নং ২৪৭২]

(খ) সাহাবাদের প্রতি নির্যাতন:

১. আবু বকর [ﷺ]-এর প্রতি নির্যাতন:

আবু বকর [ﷺ] দ্বীনের খাতিরে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর মাথার উপর ধুলো ছিটিয়েছে কাফেররা। তিনি ইসলাম প্রকাশ করতে গিয়ে 'উৎবা ইবনে রাবী'য়া তাঁকে মসজিদে হারামে জুতা দ্বারা এমন প্রহার করে যে, তাঁর চেহারা ও নাকের মাঝে পার্থক্য করা যাচ্ছিল না। জীবন-মরণের মাঝামাঝি বেহুশ অবস্থায় তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলে সর্বপ্রথম যাঁর খবর নেন, তিনি হলেন প্রিয় হাবীব [ﷺ]। তখনো মা উম্মুল খাইর ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মে জামীল বিন্তে খাত্তাব গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিকট মাকে পাঠিয়ে খবর নেন। উম্মে জামীল ও মা উম্মুল খাইরের কাঁধে ভর করে তিনি নবীজির কাছে গিয়ে পৌঁছলে নবী [ﷺ] তাঁর মাথায় চুমা দেন এবং সমস্ত নও মুসলিমরা চুমা দেন। আর নবী [ﷺ] তাঁর জন্য প্রচণ্ড দু:খ পান। এরপর তিনি মায়ের জন্য নবী [ﷺ]কে দোয়া করতে বললে তিনি দোয়া করেন। আর মা উম্মুল খাইর ইসলাম গ্রহণ করে জাহান্নামের আগুন হতে রেহাই পান। [সীরাহা নবুবীয়্যা-ইবনে কাসীর:১/৪৩৯-৪৪১ ও বেদায়া ও নেহায়া: ৩/৩০]

২. ইয়াসির (রা:)-এর পরিবারের প্রতি জুলুম:

ইয়াসির ও স্ত্রী সুমাইয়া এবং তাঁদের সন্তান 'আম্মার (রা:)। তাঁরা সকলে দাস-দাসী ছিলেন। তাঁরা চরম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন: হে ইয়াসির পরিবার!

ধৈর্যধারণ কর; জান্নাত তোমাদের ঠিকানা। 'আম্মারের পিতা-মাতা দু'জনেই শহীদ হন।

সুমাইয়া (রা:) ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। আবু জাহল সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শা দ্বারা আঘাত করলে তিনি শহাদাতের শবরত পান করেন। আর ইয়াসিরের দুই পা দ্রুতগামী দু'টি উটের পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বিপরীত মুখে উট দু'টিকে তাড়িয়ে দিলে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে শাহাদতবরণ করেন। আর আম্মারকে মক্কার প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালি ও কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। কাফেররা আম্মার [ﷺ]-এর উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। মুহাম্মদ [ﷺ]কে গালি-গালাজ করা বা লাত ও উজ্জা মূর্তির সম্পর্কে ভাল কথা না বলা পর্যন্ত অব্যহতি দেওয়া হবে না বলে বাধ্য করতে থাকে। তিনি নিরুপায় হয়ে তাদের কথা মানলে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে প্রিয় নবী [ﷺ]-এর নিকটে হাজির হন। এ মুহূর্তে নাজিল হয় কুরআনের এ আয়াত ।

W V U T S R Q P O N M [

النحل: ١٠٦ Z e X

"আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর যে কুফরি করে তার জন্য রয়েছে ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানে সুদৃঢ় থাকে (সে ব্যতীত)।"
[সূরা বনি ইসলাঈল:১০৬]

৩. বেলাল ইবনে রাবাহ (রা:)-এর প্রতি নির্যাতন:

আবু জাহ্‌ল ও উমাইয়ার হাতে বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ) যে জুলুমের স্বীকার হন তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বেলাল হাব্‌শী (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন আবু বকর (রাঃ)-এর দা'ওয়াতের মাধ্যমে। বেলালের মালিক উমাইয়া ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য তাঁর উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন চালায়। কিন্তু সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন এ উম্মতের ফেরাউন আবু জাহল তাঁকে শিকল পরিয়ে মক্কার বাহিরে নিয়ে আগুনের মত প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালির উপর হাত-পা বেঁধে শুয়ে দেয়। আর তাঁর বুকের উপর বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিয়ে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করতে থাকে। তাঁকে বেঁধে বালকদের হাতে উঠিয়ে দিত আর তারা তাঁকে মক্কার অলি-গলি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে বেড়াত।

এ সবকিছুর পরেও বেলাল (রাঃ) শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করতে থাকেনঃ "আহাদ, আহাদ" অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কঠিন অবস্থা দেখে বেলালকে উমাইয়ার নিকট থেকে ক্রয় ক'রে আল্লাহর রাহে আজাদ ক'রে দেন।

৪. মুস'আব ইবনে 'উমাইর [ﷺ]-এর প্রতি জুলুমঃ

তিনি মক্কার সবচেয়ে আরাম আয়েশের যুবক ছিলেন। বাবা-মা চরম ভালোবাসত তাঁকে। তাঁর মা ছিল একজন ধনবান মহিলা। মা তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর ও নরম পোশাক পরাত। তিনি মক্কার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। হাজরামী (ইয়েমেনের এক প্রকার দামী জুতা) পরতেন। মা হায়স (এক প্রকার উন্নত মানের খাদ্য) তাঁর মাথার কাছে হাজির রাখত যাতে করে ঘুম হতে উঠেই খেতে পারেন।

নবী [ﷺ] যখন সাফা পাহাড়ের উপর আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেলেন তখন তিনি সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেন। মা ও জাতির ভয়ে ইসলাম গোপন রাখেন। অতি গোপনে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যাতায়াত করতেন। কিন্তু উসমান ইবনে তালহা তাঁকে নামাজ আদায় করতে দেখে খরব দিলে মা ও তার জাতি তাঁকে ধরে বন্দী করে রাখে। আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত না করা পর্যন্ত তাঁকে আটকিয়ে রাখে। ইসলামের জন্য আজাব ও অভাব-অনটনের কারণে তাঁর গায়ের চামড়াগুলো সাপের চামড়ার মত হয়ে যায়। ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং দাফনের সময় মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যাচ্চিল এবং পা ঢাকলে মাথা দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় নবী [ﷺ] কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে পায়ের উপর ইযখির ঘাস দ্বারা ঢেকে দিতে বলেন। [তবাকাতুল কুবরা" ৩/১১৬ ও সিয়ার আ'লামুননুবালা- যাহাবী:৩/১০-১২]

৫. খাব্বাব ইবনে আরত [ﷺ]-এর প্রতি নির্যাতন:

তিনি মক্কায় একজন কর্মকার ছিলেন। তিনি প্রথম দিকেই ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর নবী [ﷺ]-এর নিকট যাতায়াত করতেন। তাঁর মালিক উম্মে আনমার খুজাঈয়া ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পারে। দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য তার মালিক পাথর গরম করে তাঁর পিঠের নিচে রেখে চিত করে শুয়ে দেয়। এরপর পিঠের চর্বি গলে গলে আগুন নিভালে তাঁকে ছাড়ে। এ জন্যে তাঁর সমস্ত পিঠে বড় বড় গর্ত ছিল। [মিহনাতুল মুসলিমীন ফী আহদে মাক্কী:পৃ ৯৫]

খাব্বাবকে তার মালিক একটি লোহা উত্তপ্ত করে মাথায় রাখলে কষ্ট পায় এবং নবী [ﷺ]কে খবর দিলে তিনি তাঁর সাহায্যের

জন্য দোয়া করেন। এরপর তাঁর মালিক উম্মে আনমারের মাথায় সমস্যা হয়। এমনকি সে মহিলা কুকুরের সঙ্গে থাকত। তার চিকিৎসার জন্য তাকে বলা হয়: লোহা গরম করে সেঁক দাও। তখন সে খাব্বাবের কাছে যায় এবং তিনি [ﷺ] ঐ লোহা দ্বারা উত্তপ্ত করে তাকে সেঁক দেন যা দ্বারা সে তাঁকে সেঁক দিয়েছিল। [মিহনাতুল মুসলিমীন ফী আহদে মাক্কী:পৃ ৯৬]

৬. খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে 'আস [ﷺ]-এর প্রতি জুলুম:

তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একটি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অন্য একজন তাকে আগুনে ঠেলে দিচ্ছে। আর সে যেন আগুনে না পড়ে সে জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখছেন। তিনি স্বপ্নের কথা আবু বকরের নিকট বর্ণনা করলে তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গোপন রাখার পরেও বেশি বেশি অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁর বাবা জানতে পেরে তাকে ধরে বন্দী করে রাখে। তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এমনকি তিন দিন যাবত খানাপিনাও বন্ধ করে দেয়। এরপরেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি। [সিয়ার আ'লামুননুবালা-যাহাবী:১/২৬০]

৭. জিন্নারাহ, নাহদিয়া ও তাঁর কন্যা উম্মে উবাইস (রা:):

এঁরা সকলে দাসী ছিলেন। ইসলাম কবুল করার ফলে তাঁদের প্রতি মুশরেকরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

@ প্রথম হিজরত:

যাদের ইসলাম প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের উপর মুশরিকদের অহরহ নির্যাতন চলতে থাকে, বিশেষ করে দুর্বলদের উপর।

অনেক মুসলমান নিজেদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার অভাবে ভুগতেছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দ্বীন রক্ষার্থে নও মুসলিমদেরকে হাব্‌শা তথা আবিসিনিয়ার (যা বর্তমানে ইথিওপিয়া নামে পরিচিত) বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট হিজরত করার জন্য নির্দেশ করেন। নাজ্জাশী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অবগত ছিলেন যে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তার নিকটে কেউ মাজলুম তথা নির্যাতিত হবে না।

নবুয়াতের ৫ম সালে রজব মাসে সাহাবাদের প্রথম দলটি আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তাঁদের সংখ্য ছিল ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা। দলপতি ছিলেন যুন নূরাইন উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা:)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী রোকায়া বিন্তে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। এঁদের দু'জন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: এটিই প্রথম পরিবার যারা ইবরাহিম (আ:) ও লূত (আ:)-এরপরে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করতেছে।

@ দ্বিতীয় হিজরত:

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন চরম রূপ ধারণ করায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য পরামর্শ দিলেন। মুসলমানগণ হাবশায় দ্বিতীয় বার হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ হিজরতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তবে প্রথম বারের চেয়ে অনেক কঠিন। এ বারে হিজরত করেছিলেন আম্মারসহ [তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে] পুরুষ ৮৩ জন আর মহিলা ১৮ অথবা ১৯ জন।

কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান বিনষ্ট করার জন্য বাদশাহ নাজ্জাশীকে হাদিয়া পেশ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ঈসা (আ:)কে গালি দেওয়ার অপবাদ দেয়। কিন্তু মুসলমানগণের পক্ষ থেকে যখন নাজ্জাশীর সামনে ঈসা (আ:) সম্পর্কে জাফর ইবনে আবি তালিব (রা:) ইসলামের ভাষ্য তুলে ধরেন এবং বাদশাকে সত্য কথা বুঝিয়ে দেন, তখন তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। ফলে মুসলমানদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কুরাইশদের কুচক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

@ ইসলামের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদঃ

জুলুমের সীমা লঙ্ঘনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে হঠাৎ করে ইসলামের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো সবাইকে অবাক করে তুলল। নবুয়াতের ৬ষ্ঠ সালের শেষের দিকে সম্ভাব্য যিলহজ্ব মাসে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল: একদা আবু জাহ্ল "সাফা" পাহাড়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে ভীষণভাবে মাথায় আঘাত করে। ফলে তাঁর মাথা হতে রক্ত ঝরে। এরপর আবু জাহল কা'বার পাশে এসে বসেছিল। এ সময় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোন কথাই বলেননি।

এ কথা হামজা জানতে পেরে ধনুক হাতে দৌড়ে আসে এবং খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আবু জাহ্লকে গালি দিয়ে বলেন: হে উলঙ্গ পাছা ওয়ালা! তুমি আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছ ও মারধর করেছ অথচ আমি তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত?

অত:পর ধনুক দিয়ে আঘাত করে আবু জাহলের মাথায় ক্ষত করে দেন। যার কারণে আবু জাহ্ল ও হামজার গোত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পরিশেষে আবু জাহল বলে উঠে: আবু উমারাকে [হামজার উপনাম] তোমরা কেউ কিছু বলো না। কারণ, আমি তার ভাতিজাকে বহু মন্দ গালি দিয়েছি ও মারধর করেছি।

প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ (স:)কে গালি দেওয়ায় ধৈর্যহারা হয়ে তিনি ভাতিজার প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর অন্তর খুলে দেন এবং সত্য বুঝার তওফিক দেন। যার ফলে তিনি ইসলামের দৃঢ়তার রশিকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরেন। মুসলমানগণ তাঁর ইসলাম গ্রহণে বিরাট আকারে শক্তিশালী ও সম্মানিত হন।

@ ইসলামের পূর্বগগনে সূর্যের আলো:

এ কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামকে আরো অনেক বেশি আলোকিত করে উমার ইবনে খত্তাবের ইসলাম গ্রহণ। তিনি নবুয়াতের ৬ষ্ঠ সালে যিলহজ্ব মাসে হামজা (রা:)-এর ইসলামের ৩ দিন পরে ইসলামে দীক্ষিত হন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উমারের ইসলামের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাাম] তাঁর দোয়াতে বলেন:"হে আল্লাহ! আপনার নিকট দু'জনের মধ্যে পছন্দনীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। উমার ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহ্ল।" [তিরমিযী ও তবারানী]

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট উভয়ের মধ্যে প্রিয়তম ছিল উমার ইবনে খাত্তাব; তাই তাঁর দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যে দিন থেকে উমার (রা:) ইসলাম গ্রহণ করেন, সে দিন থেকে

আমরা সম্মানে আছি। তিনি আরো বলেন: আমরা উমার (রা:)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা'বা ঘরের নিকট সালাত আদায় করতে পারতাম না।

সুহাইব রূমী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: উমার (রা:)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম প্রকাশ লাভ করেছে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত শুরু হয়েছে। আর কা'বা ঘরের সামনে গোল হয়ে বসার এবং কা'বা ঘর তওয়াফের সুযোগ হয়েছে। আমাদের উপর কেউ বাড়াবাড়ি করলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং অত্যাচারের জবাব দেওয়ার সুযোগ হয়েছে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উমার (রা:)কে "ফারুক" উপাধিতে ভূষিত করেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উমারের ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, উমার (রা:) বললেন: তাহলে কেন আমরা পালিয়ে ও গোপনে থাকব?!

এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবুল আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে মুসলমানদেরকে নিয়ে দু'টি লাইনে বিভক্ত হয়ে বের হলেন। একটি লাইনের সামনে হামজা (রা:) এবং অপরটির সামনে উমার (রা:)। মুসলমানগণ এমন ভঙ্গিমায় মক্কার বিভিন্ন গলিতে চক্কর দিতে থাকেন, যা দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা দা'ওয়াতের ময়দানের শুরুতেই অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।
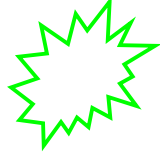
@ নির্দয় অবরোধ
@ শোকের পাহাড়
@ মক্কার বাইরে দা'ওয়াত
@ রব্বানী শান্ত্বনা
@ হজ্ব উপযুক্ত দা'ওয়াতী মৌসুম
@ অহির আলো উদ্ভাসিত
@ কষ্ট বাড়ার সাথে ঈমান বাড়ে
@ কষ্টের পরেই রয়েছে স্বস্তি
@ কল্যাণের কাজে অগ্রগামী

@ নিষ্ঠুর বয়কটঃ

ইসলামি দা'ওয়াত ও তবলীগকে বন্ধ করার জন্য মক্কার কাফেররা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক প্রচেষ্টা করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তারা নতুন আঙ্গিকে নতুন পথ আবিস্কার করল। আর তা হলোঃ মুশরেকরা মুসলমান এবং বনি হাশেমের সাথে সার্বিক বয়কটের উপর সকলের স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিপত্র কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে দিল। ফলে মুসলমানদের সাথে বেচাকেনা, বিবাহ-শাদী, আদান-প্রদান সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে "শি'য়াবে আবু তালিব" নামক গিরিপথে একত্রিত হন। সেখানে তাঁরা বিভিন্নমূখী কঠিন কষ্ট এবং সমস্যার সম্মুখীন হন, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা ছিল অসহনীয়। বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়। আর ছোট ছোট বাচ্চাদের আর্তনাদ ও আহাজারিতে আকাশ ভারি হয়ে উঠে।

এমন কঠিন পরিস্থিতি দেখে খদীজা (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের জন্য ব্যয় করেন। এ অসহনীয় কষ্ট সত্বেও কেউ তওহিদ ছেড়ে কুফর ও শিরকের দিকে ফিরে আসেননি। এভাবে দীর্ঘ ৩বৎসর কাল পর্যন্ত বয়কট বলবৎ থাকে। এরপর কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক বয়কট বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা করে।

এদিকে নবী [ﷺ] চুক্তিপত্রটি পোকায় খেয়ে ফেলেছে বলে খবর দেন। যখন তারা স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রটি বের করে দেখল, তখন সত্যিই উইপোকা খেয়ে ফেলেছে দেখতে পেল। শুধু ছোট্ট একটি অংশ বাকি ছিল যাতে লেখা ছিল:"তোমার নামে হে আল্লাহ!" সমস্যার সমাধান হল। মুসলমানগণ এবং বনি হাশেম

মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু দু:খের বিষয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের নির্মম নির্যাতনের কোনই পরিবর্তন হলো না।

@ দু:খের বছর:

আবু তালিব কঠিন অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কালিমা তায়্যেবা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" পড়ানোর জন্য। এ দিকে আবু জাহ্ল সার্বিকভাবে বুঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে যেন তিনি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ না করেন। সে বলছে সাবধান! বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবেন না। পরিশেষে শির্কের উপর মৃত্যুবরণ করলেন চাচা আবু তালিব।

এটা ছিল নবুয়াতের দশম সালের রজব মাসে। নবী [ﷺ]-এর নিরাপত্তায় একান্তভাবে সাহায্যকারী চাচার কুফরি অবস্থায় মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বেদনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এর প্রায় দু'মাস পরে রমজান মাসে মৃত্যু ঘটে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) স্ত্রী খাদীজা (রা:)-এর। ফলে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিদারুনভাবে দু:খিত ও শোকার্ত হন। তাঁদের উভয়ের বিদায়ের পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মুসিবত বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর এ জন্যেই এ বছরটিকে দু:খের বছর বলা হয়।

@ রাহমাতুল্ লিল'আলামীন তায়েফে:

কুরাইশরা যখন সার্বিক সীমালঙ্ঘন এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেওয়ার পথ সুগম করেই চললো এবং রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের মঙ্গলের আশা ছেড়ে দিলেন, তখন তায়েফবাসীর হেদায়েতের আশা নিয়ে

নবুয়াতের ১০ম সালের শাওয়াল মাসের দিকে [৬১৯ ইং সনের জুনের শেষে অথবা জুলাইয়ের শুরুতে] সেদিকে রওয়ানা হলেন। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সঠিক পথ দেখাবেন। মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। চতুষ্পার্শ্বে বিশাল বিশাল পাহাড়ে বেষ্টিত তায়েফের সফর সহজ ছিল না। তবুও অনেক কষ্টে জায়েদ ইবনে হারেছাহ্ (রা:)কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন।

কিন্তু দু:খের বিষয় তাদের থেকে হেদায়েত কবুলের কোন লক্ষণ তো পেলেন না। বরং দুর্বৃত্তরা দুর্ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে কষ্ট দেওয়ার জন্য উচ্ছৃঙ্খল বালকদেরকে উস্কানি দিয়ে পিছু ক'রে দিল। ওরা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে পাথর ছুঁড়তে লাগল এবং মেরে রক্তাক্ত ক'রে দিল। নবী [ﷺ]-এর জীবনে সব চাইতে কষ্টের দিন ছিল এই তায়েফের দিন।

তিনি অতি দু:খভরা হৃদয় নিয়ে পুনরায় মক্কার দিকে ফিরার পথে পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে নিয়ে জিব্রীল (আ:) তাঁর নিকট হাজির হলেন এবং বললেন: আল্লাহ তা'আলা আপনার নিকট পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা বললেন: হে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! যদি আপনি চান তাহলে এর অধিবাসীদেরকে "আখশাবাইন" পাহাড়দ্বয় দ্বারা পিষে দেই।

রাহমাতুল লিল'আলামীন উত্তরে বললেন: বরং আমি চাই আল্লাহ তা'আলা তাদের ঔরষ থেকে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে

শরিক করবে না। এমন কঠিন মুহূর্তেও তিনি তাঁর দা'ওয়াতের মূল উদ্দেশ্য তাওহিদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলেন।

মা আয়েশা (রা:) রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে জিজ্ঞাসা করেন: উহুদের দিনের চাইতেও কি আর কোন দিন আপনার জাতি থেকে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন? উত্তরে তিনি তায়েফের ঘটনা বর্ণনা করেন।[১]

@মক্কার বাইরে দা'ওয়াতের আলোর ঝলক:

কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, ঠিক তখন তিনি নতুন আঙ্গিকে দা'ওয়াত শুরু করলেন। হজ্বের সময় যে সকল জায়গায় লোকজন একত্রিত হত, সেখানে গিয়ে তিনি তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত এবং সঠিক দ্বীন বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর চাচা আবু লাহাব মানুষদেরকে তাঁর দা'ওয়াত থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতে থাকে।

এভাবে তিনি একদিন ইয়াছরিবের[২] এক দলের নিকট এসে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। তারা মনযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনার পর সবাই ঈমান আনলেন এবং তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দান করলেন। কেননা তাঁরা ইহুদিদের নিকট থেকে শুনতো যে, অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাই দা'ওয়াত পৌঁছা মাত্রই তাঁরা বুঝতে পারলেন তিনিই সেই নবী যার ব্যাপারে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৩১, ৭৩৮৯ মুসলিম ৬/৩৬০

[২]. "ইয়াছরিব" মদীনার পুরাতন নাম।

ইহুদিরা বলাবলি করে। আর প্রথমেই তাঁরা ইসলাম কবুল করেন যেন ইহুদিরা তাঁদের আগে এ সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। এঁদের সংখ্যা ছিল ৬ জন। এ ঘটনাটি ছিল নবুয়াতের একাদশ বছরের হজ্বের মৌসুমে। তাঁরা সবাই নিজ গোত্রে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর অঙ্গীকার করে ইয়াছরিবে ফিরে যান।

@প্রথম বায়েতে আকাবাঃ [১]

এর পরের বছর হজ্বের সময় ইয়াছরিব থেকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] কাছে ১২ জন লোক আসেন। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কুরআনুল করীমে বর্ণিত মহিলাদের বায়েত অনুরূপ তাঁদের সঙ্গে প্রথম বায়েত করেন।[২] রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁদেরকে ইসলামের তা'লীম (শিক্ষা) দেন এবং তাঁদের সঙ্গে মু'য়াল্লিম (শিক্ষক), দা'য়ী (আহব্বায়ক) ও দূত হিসাবে মুস'আব ইবনে উমাইর (রা:)কে ইয়াছরিবে (মদিনায়) পাঠান। তিনি তাঁদেরকে কুরআন কারীমের তা'লীম (শিক্ষা) এবং দ্বীনের অন্যান্য বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যান। আর ইসলামের সর্বপ্রথম মু'য়াল্লিম (শিক্ষক) এবং সর্বপথম রাষ্ট্রদূত তিনিই। তিনি মদীনাবাসীদের উপর দা'ওয়াতের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

@ দ্বিতীয় বায়েতে আকাবাঃ

---

[১]. "আকাবা" সংকীর্ণ গিরি পথকে বলা হয়। মক্কা থেকে মিনা আসার পথে মিনার পশ্চিম পশ্চিম পার্শ্বে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। এই গিরিপথ "আকাবা" নামে পরিচিত। দশই জিলহজ্ব তারিখে যে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা এ সুড়ঙ্গ পথের মাথায় অবস্থিত বলে একে জামরায়ে আকাবা বলা হয়।

[২]. বুখারীঃ ১/ ৫৫০-৫৫১

নবুয়াতের ১৩ম বর্ষে ৬২২ ইং জুন মাসে ইয়াছরিবের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা মুসলমান হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে আসেন। মক্কায় পৌঁছার পর তাঁদের সাথে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর গোপনে কথা হয়। উভয় পক্ষ আইয়ামে তাশ্‌রীক (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্ব)-এর মাঝামাঝিতে আকাবার পার্শ্বের ঘাঁটিতে অর্থাৎ মিনার প্রথম জামরার নিকট সমবেত হবেন। আর এটা হবে সম্পূর্ণ গোপনে এবং রাত্রির অন্ধকারে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁদেরকে নিয়ে সম্মিলিত হলেন এবং তাঁরা রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তাঁর দ্বীনের সাহায্য করার এবং সর্বদা তাঁর আদেশ পালনের অঙ্গিকার ব্যক্ত করলেন। এ বায়েত পরিপূর্ণ হওয়ার পর তাঁরা ইয়াছরিবে ফিরে গেলেন।

@বায়েতের দফাসমূহ:

ইমাম আহমাদ (রহ:) জাবের (রা:) হতে এর বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন। জাবের (রা:) বলেন: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! আমরা কোন্ কোন্ দফার উপর আপনার বায়েত গ্রহণ করবো? তিনি বললেন:

১. ভালোমন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং আমাকে মানবে।
২. স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল উভয় অবস্থাতে দ্বীনের জন্য ব্যয় করবে।
৩. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।
৪. আল্লাহর পথে সত্য কথা বলবে, তাতে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।
৫. তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে ঐভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও সংরক্ষণ করবে, যেভাবে তোমরা নিজেদের ও স্ত্রী-সন্তাদেরকে সংরক্ষণ কর। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

বায়েত পরিপূর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদের মধ্য হতে ১২ জনকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করলেন। এঁরা নাকীব বা মুখপাত্র হিসাবে তাঁদের মধ্যে বায়েতের এই দফাসমূহ বাস্তবায়ন করবেন। তাঁদের মধ্যে “আওস” গোত্র থেকে ছিল ৩ জন এবং বাকি ৯ জন ছিল “খাযরাজ” গোত্রের।

P দারুল হিজরত

P বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত

P দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

P নতুন ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা

P দ্বীনি ভ্রাতৃত্ববোধ

দা'ওয়াতের নতুন দফতর ও আবাসভূমি

দ্বিতীয় বায়েতে আকাবার পর ইসলাম তার নিজ আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর এটা ছিল এমন একটি মরুভূমির মাঝে যা ছিল কুফরি এবং অজ্ঞতায় ভরা। এ আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা ছিল ইসলামি দা'ওয়াত শুরু হওয়ার পর ইসলামের জন্য অন্যতম সবচেয়ে বড় সাফল্যতা। মদীনা হক ও হকপন্থীদের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। মুসলমানগণ সেখানে হিজরত শুরু করেন, যদিও কুরাইশরা মুসলমানদের বাধা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

তাই তাঁরা কুরাইশদের ভয়ে গোপনে হিজরত করতেন। তবুও কোন কোন মুহাজিরকে সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও নির্যাতনের। সর্বপ্রথম যিনি মদীনায় হিজরত করেন তিনি হলেন আবু সালামা (রা:)।

উমার ইবনে খত্তাব (রা:) -এর হিজরত ছিল চ্যালেঞ্জ এবং বীরত্বের এক অনন্য নিদর্শন। তলোয়ার ও তীর-ধনুক নিয়ে মুজাহিদ বেশে কা'বার দিকে অগ্রসর হয়ে তওয়াফ করেন এবং তওয়াফ শেষে মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হয়ে বলেন: আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি, নিজ স্ত্রীকে বিধবা এবং সন্তানকে এতিম বানানোর সাধ যার জাগে, সে যেন আমাকে বাঁধা দিতে আসে। এ কথা বলে তিনি চলা শুরু করেন। কিন্তু তাঁকে বাধা প্রদান করার সাহস কেউ করেনি।

আবু বকর (ﷺ) রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর থেকে হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন: "তাড়াহুড়া করো না, আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমার সাথী ক'রে দিবেন।"

@ কুরাইশী পার্লামেন্টে জরুরি অধিবেশনঃ

মুশরেকরা যখন দেখলো, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] -এর সাহাবাগণ ছেলে-সন্তান, মাল-সম্পতি সবকিছু নিয়ে মদীনায় আওস ও খাযরাজ গোত্রের দিকে যাচ্ছে, তখন তাদের বিষণ্নতা ও আতঙ্ক বাড়তে লাগল। অস্থিরতা ও অশান্তি সীমা এমনভাবে বেড়ে গেল যার দৃষ্টান্ত পূর্বে ছিল না। কেননা, তারা সামনে এমন এক কঠিন ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা বোধ করতে লাগল, যা তাদের পৌত্তলিকতা ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাড়াচ্ছিল।

তাই তারা নবুয়াতের ১৪তম বর্ষে ২৬শে সফর (১২ই ডিসেম্বর, ৬২২ ইং সনে) অর্থাৎ দ্বিতীয় বায়েতে আকাবার প্রায় দু’মাস পর দিনের প্রথমাংশে মক্কা পার্লামেন্টে (দারুন-নাদওয়ায়) এক জরুরি অধিবেশনের আহ্বান করলো। ইহা তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক সম্মেলন ছিল। এর প্রতিনিধিত্ব করছিল কুরাইশদের প্রতিটি গোত্রের প্রধানরা। সবাই মিলে এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল যে, কিভাবে তওহিদী দা‘ওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী মুহাম্মদকে অতিশীঘ্র চিরতরে খতম করে শেষবারের মত ইসলামের আলোকে নিভানো যায়। এক নাজদী বৃদ্ধের বেশ ধরে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইবলীস শয়তান। আর স্পিকারের দায়িত্ব পালন করে সে নিজেই।

@ পার্লামেন্টে হত্যার নিষ্ঠুর বিল পাশঃ

বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব আসার পর দীর্ঘ সময় তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলে। সর্বশেষে সিদ্ধান্ত হয়, মুহাম্মদের

হত্যার। আবু জাহ্‌ল বলল: প্রত্যেক গোত্র তালোয়ারসহ একজন ক'রে শক্তিশালী যুবক দেবে। সশস্ত্র যুবকরা মুহাম্মদকে ঘিরে একযোগে হামলা ক'রে হত্যা করবে। অত:পর তার রক্ত বিভিন্ন গোত্রে বণ্টন করা হবে। এর ফলে কখনও বনি আবদে মুনাফ (রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর গোষ্ঠী) সকল গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। শেষ পর্যন্ত তারা দিয়ত[১] নিতে বাধ্য হবে। আর আমরা সকলে মিলে তার দিয়ত (রক্তমূল্য) দিয়ে দেব। নাজদী বৃদ্ধ ইবলীস বলল: তার কথাই কথা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত হতেই পারে না।

মক্কার পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে এ নিকৃষ্ট-অপরাধী এক চরম জঘন্য নিষ্ঠুর হত্যার বিল পাশ হয়ে গেল। প্রত্যেক প্রধানরা এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। কাফেরদের এ নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

l k j i h g f e d c b a ` [

الأنفال: ٣٠ Z r q p o m

"আর কাফেররা যখন ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা করে তেমনি আল্লাহও ছলনা করেন। বস্তুত: আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।" [সূরা আনফাল:৩০]

@ মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে মদিনায় হিজরত:

---

[১] .হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত রক্তপণ ১০০ উট বা এর মূল্য।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাফেরদের ইব্লিসী চক্রান্ত অহির দ্বারা জানতে পেরে আবু বকরের সাথে মদীনায় হিজরতের পরিকল্পনা করলেন। আলী (রা:)কে নিজ বিছানায় নিজের চাদর পরে ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন; যেন তারা মনে করে যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বাড়িতেই অবস্থান করছেন। চক্রান্তকারীরা বাড়ি ঘিরে রাখল এবং আলী (রা:)কে মুহাম্মদের জায়গায় দেখে মনে করল মুহাম্মদই শুয়ে আছে।

তাই তারা অপেক্ষায় থাকল বাহির হলেই নির্মমভাবে একযোগে হত্যা করবে। তারা এভাবে ঘিরেই থাকল, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন এক মুষ্টি ধুলো-বালি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নিলেন; যার ফলে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বের হয়ে আবু বকরের নিকট চলে গেলেন। এদিকে তারা কিছুই টের পেল না। অত:পর আবু বক্‌র (রা:)-এর সাথে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কার দক্ষিণে ৫ মাইল দূরে ছাওর পাহাড়ের গুহায় উভয়ে আত্মগোপন করেন।

এদিকে কুরাইশদের যুবকরা ভোরে যখন রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বিছানায় আলীকে পেল তখন সবাই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। কিন্তু তাঁর কাছে কোন খবরা খবর না পাওয়ায় মার-ধর এবং টানা-হেঁছড়া করে ছেড়ে দিল। এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে তালাশ করার জন্য ঘোষণা দিল: যে মুহাম্মদকে জীবিত অথবা মৃত এনে দিতে পারবে তাকে ১০০টি উট পুরস্কার

দেওয়া হবে। তারা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এমনভাবে গিয়ে পৌঁছলো যে, তারা যদি নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি করে তাহলে তাঁদেরকে দেখে ফেলবে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে নিয়ে আবু বকর (রা:)-এর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বললেন:

((مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)). رواه البخاري.

" আবু বকর! তোমার কি ধারণা আমরা দু'জন, আল্লাহ তো তৃতীয় জন আছেন।" [বুখারী]

আবু বকর চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। কেউ তাঁদের দু'জনকে দেখতে পেল না।

আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনার বর্ণনা করে বলেন:

[u v w x y z { | } ~ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ

هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا © إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ

سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ ´ µ ¶ ¸ كَلِمَةَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ Z التوبة: ٤٠

"যদি তোমরা তাকে (রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে) সাহায্য না কর তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মাধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন: বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অত:পর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সন্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী

পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত: আল্লাহ কাফেরদের কথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা:৪০]

এভাবে তাঁরা ৩দিন পর্যন্ত সাওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করলেন। তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় মক্কার বাজারের হাজওয়ারা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে মক্কাকে সম্বোধন করে বলেন:
আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তুমি আল্লাহর জমিনে সর্বোত্তম ভূমি এবং আল্লাহর জমিনের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমার থেকে আমাকে বের করা না হত, তাহলে আমি কখনো বের হতাম না।" [সহীহ সুসানে তিরমিযী: হা:৩৯২৫]

অত:পর উত্তরে মদীনার দিকে চলা শুরু করেন। রাস্তা ছিল খুব দূর্গম ও দীর্ঘ। তাঁদের পথ প্রদর্শক ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকেত নামক এক মুশরেক ব্যক্তি, তার রাস্তা চেনার অভিজ্ঞতা ছিল খুব ভাল। তাঁদের সঙ্গে আরো ছিলেন আবু বক্‌র (রা:)-এর দাস আমের ইববে ফুহাইরাহ্।
হিজরতের সময় তিনি [ﷺ] এ দোটি পাঠ করেন:

f e dc b a ` _ ^] \ [[

g h Z الإسراء: ٨٠

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে (মদিনায়) উত্তমভাবে দাখিল করুন এবং আমাকে (মক্কা থেকে) বের করুন উত্তমরূপে। আর আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী শক্তি প্রস্তুত করুন।" [সূরা বনি ইসলাঈল:৮০]

হিজরতের দ্বিতীয় দিনে তাঁরা উম্মে মা'বাদ নামের এক মহিলার তাঁবু অতিক্রম করার সময় তার কাছে খানাপিনা চান।

কিন্তু তার কাছে একটি অতি দুর্বল ছাগী ছাড়া আর কিছুই পাননি। ছাগীটির ওলানে এক ফোঁটাও দুধ ছিল না। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর হাত মোবারক ওলানে (স্তনে) বুলালে দুধ আসে এবং তিনি (দুধ) দোহন করে পান করেন। আর পাত্র পরিপূর্ণ করেন যা থেকে সবাই পান করে। পরে পূর্ণ পাত্র দুধ উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে পথ চলতে শুরু করলেন।

পথে বুরাইদা ইবনে হুসাইব রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে মিলিত হয়। সে পুরস্কারের আশায় তাঁর তল্লাশীতে বের হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সঙ্গে কথা বলার পর সে এবং তার গোত্রের ৭০ জন মানুষ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাস্তায় সোরাকা ইবনে মালেক পুরস্কারের লোভে হিজরতী কাফেলার অনুসরণ করছিল। সে নিকটে পৌঁছলে আবু বকর কাঁদতে ছিলেন। নবী [ﷺ] তার উপর বদদোয়া করলে শক্ত মাটিতে ঘোড়ার দুই পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায় এবং সে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়। অত:পর সোরাকা নিরাপত্তা চেয়ে ডাক দিলে তাঁরা থামলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সোরাকাকে বললেন: যদি আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা কর তবে রেহাই পাবে। সে সম্মতি জানালে নবী [ﷺ] দোয়া করাতে ঘোড়ার পা উঠে গেল।

সোরাকা এক টুকরা চামড়ায় নিরাপত্তার পরোয়ানা যা আমের ইবনে ফুহাইরাহ্ লিখে দিলেন নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। সোরাকা ফিরে এসে দেখল তখনো মানুষ অনুসন্ধান করছে। সে বলল: ওদিকে তোমাদের যে প্রয়োজন ছিল সেটা আমি করে এসেছি। ওদিক ছাড়া অন্যান্য দিকে তালাশ কর। দিনের শুরুতে

যে লোকটি হিজরতী কাফেলার বিরুদ্ধাচারী ছিল দিনের শেষে সেই ব্যক্তিই হয়ে গেল তাঁদের জন্য প্রহরী। সুবহানাল্লাহ!

@ ইসলামের প্রথম মসজিদঃ

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ৮ রবিউল আওয়াল[১] কুবায় পৌঁছে কুলছূম ইবনে হাদাম [رضي الله عنه]-এর ঘরে অবতরণ করেন।

ওদিকে মদীনাবাসীরা প্রতিদিন মদীনার বাহিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আগমনের অপেক্ষা করত। তাই কুবা নগরীতে নবী [ﷺ] পৌঁছা মাত্রই তাঁরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে গেলেন। ওদিকে আলী (রা:) ৩দিন মক্কায় অবস্থান করে সবার আমানত বুঝিয়ে দিয়ে এরপর হিজরত করেন।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেখানে ৪দিন অবস্থান করেন এবং তাকওয়ার উপর কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। এ মসজিদ ও কুবাবাসী সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

P O N M K J I H G F E D C B A [

التوبة: ١٠٨ Z V U T S Q

"যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপরে প্রথম দিন থেকে, সেটিই আপনার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে

১. ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ইং সাল।

এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।" [সূরা তাওবা:১০৮]

৫ম দিনে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বাহনে তাঁর পিছনে ছিলেন তাঁর সফরসঙ্গী আবু বক্র সিদ্দীক (রা:)।

এদিকে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর মামার বাড়ী বনি নাজ্জারে পূর্বেই খবর পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে এসে হাজির হন।

জুমার দিন রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং সকলে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে। বনি সালেম ইবনে আউফে আসার পর জুমার সময় হলে সাহাবীদেরকে নিয়ে জুমার সালাত আদায় করেন। সে দিন তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র একশত জন।

@ দারুল ইসলামে প্রিয় হাবীবের আগমনঃ

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জুমার সালাত আদায়ের পর মদীনায় প্রবেশ করলেন। সেদিন থেকেই "ইয়াছরিব"[১] শহরটির নাম রাখা হল "মদীনাতুররসূল" তথা রসূলের শহর। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মেহমানদারীর জন্য আনসারগণ উষ্ট্রীর লাগাম ধরে প্রতিযোগিতা শুরু করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেনঃ আমার উষ্ট্রী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে যেখানে বসবে সেখানেই আমি অবতরণ করব।

[১]. রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদীনায় হিজরত করার পূর্বে "মদীনা" শহরটির নাম ছিল "ইয়াছরিব"।

উষ্ট্রীটি এক জায়গাতে এসে বসে গেল, ইহা ছিল আবু আইয়ূব আনসারী (রা:)-এর বাড়ীর সামনে। আর সেটাই ছিল মসজিদে নববী (নবীর মাসজিদ)-এর জায়গা। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু আইয়ূব আনসারী (রা:)-এর ঘরে মেহমানদারী কবুল করলেন। নবী [ﷺ]-এর ঘর-বাড়ি নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত তিনি আবু আইয়ূবের বাড়িতেই অবস্থান করেন।

@ মসজিদ নববীর নির্মাণঃ

মদীনায় পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন তা ছিল মসজিদে নববীর নির্মাণ। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উষ্ট্রী যেখানে বসেছিল তিনি সে জায়গাটি মসজিদের জন্য নির্বাচন করলেন। এ জায়গাটি তিনি দুই এতিম ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নেন।

এ জায়গাটিতে মুশরিকদের কবর এবং সেখানে বিধ্বস্ত কিছু জিনিস ছিল। এখানে খেজুর গাছ এবং গরকাদ বৃক্ষ ছিল। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নির্দেশে সমস্ত কবর খুঁড়ে ফেলা হলো এবং গাছ-পালা কেটে মাটি সমান করা হলো। বাইতুল মাকদিসের দিকে কিব্‌লা নির্ধারণ করা হলো। নির্মাণ কাজে তিনি [ﷺ] নিজেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইট এবং পাথর বহন করেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহ, প্রকৃত জীবন তো আখেরাতের জীবন। তুমি আনসার এবং মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন। এই বোঝা খায়বারের বোঝা নয়, এটা আমাদের প্রতিপালকের অতি সৎ এবং পবিত্র বোঝা।

মসজিদটির নিচের অংশ পাথর দিয়ে মজবুত করা হলো। এর দেয়াল ছিল ইট এবং গাঁথুনী ছিল মাটির। ছাদ ছিল খেজুর

ডালের এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। মেঝে ছিল ছোট ছোট পাথর ও বালির। ভিত ছিল প্রায় তিন হাত। দৈর্ঘ ও প্রস্থ ছিল ১০০ হাত করে। মসজিদটির তিনটি দরজা বানানো হয়।

@ ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াহ্:

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করলেন। মসজিদ পরস্পরের ভালোবাসা বিনিময় ও সমন্বয়ের কেন্দ্র। এরপর যে জরুরি কাজটি তিনি করলেন, তা মানব ইতিহাসে স্মরণীয় ও অতি বিরল। আর তা হচ্ছে মুহাজির (যাঁরা নিজেদের দেশ ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন) এবং আনসার (যাঁরা মদীনার আদি বাসিন্দা মুহাজিরদের সাহায্যকারী) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন। আনসারদের মধ্য হতে একজনকে মুহাজিরদের একজনের ভাই বানিয়ে দিলেন। এতে ছিল মৃত্যুর পর মুহাজির ভাই আনসারী ভাইয়ের মাল-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবেন। এ বিধান বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত ছিল, পরবর্তিতে রহিত হয়ে যায়।

এ ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিলোঃ ইসলাম ছাড়া জাহিলি যুগের সকল স্বজনপ্রীতি বিনাশ করা এবং বংশপূজা, বর্ণপূজা, দেশপূজা ইত্যাদির বিভেদ এবং দূরত্ব মিটিয়ে দেওয়া। সর্বক্ষেত্রে তাকওয়াকেই প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে দেখা। একমাত্র ইসলামের কারণেই কারো সাথে সম্পর্ক গড়া ও ছিন্ন করা ইত্যাদি।

মুহাজির এবং আনসার উভয়েই একযোগে কাজ শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গভীর হতে লাগল। তাঁদের মধ্যের এ ভ্রাতৃত্ব কেবল মাত্র মৌখিক কোন বিষয় ছিল না। বরং এটা ছিল এমন একটি বাস্তব বিষয়, যার সঙ্গে

জানমালের সম্পৃক্ততা ছিল। তাঁদের এ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্যতা, সমবেদনা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেত।

তাঁদের নতুন সমাজটি একটি চমৎকার আদর্শ সমাজে পরিণত হয়েছিল। যার বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ মুহাজির সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) এবং আনসার সাহাবী (রা:) সা'দ ইবনে রাবী' (রা:)-এর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আনসারী ভাই সা'দ তাঁর মুহাজির ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে তাঁর সমস্ত মাল-সম্পতি পেশ ক'রে বলেন: সমপরিমাণে বণ্টন ক'রে অর্ধেক আপনি নিন এবং অর্ধেক আমাকে দিন। আর আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে যাকে বেশি পছন্দ হয় তাকে তালাক দিচ্ছি ইদ্দত শেষ হলে আপনি বিবাহ করুন।

ইমাম বুখারী (রহ:) আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন: আনসারগণ রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বললেন: আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাজি হলেন না। তখন আনসারা বললেন: তাহলে মুহাজির ভাইগণ আমাদের বাগানে কাজ করবেন বিনিময়ে আমরা তাঁদেরকে উৎপাদিত ফসলের অংশ দেব। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এতে সম্মতি দিলেন এবং আনসারগণও তা মেনে নিলেন।
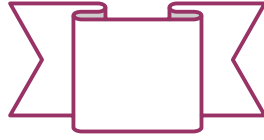
জাজিরাতুল আরবের বাইরে দা'ওয়াত

ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক নতুন ধারার সূচনা করে। এর ফলে সবচেয়ে বড় যুদ্ধবাজ তিনটি দল: কুরাইশ, গাতফান ও ইহুদিদের মহা ঐক্যজোটের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ইহুদিরা মদিনা হতে বিতাড়িত হওয়ার পর খায়বারে একাত্রিত হলে ইহা ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়। তাই নবী [ﷺ] সর্বপ্রথম ইহুদিদের প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনেকটা নিরাপত্তা ও শান্তি সৃষ্টি করলে ইসলামি দা'ওয়াত ও তবলীগের সুন্দর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই মহাসুযোগের ফলে নবী [ﷺ] দা'ওয়াত ও তবলীগের পরিধী বাড়ানো ও বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ এবং সম্রাট ও সমাজপতিদের নিকট দা'ওয়াতপত্র প্রেরণের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেন।

৬ষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে হুদায়বিয়া হতে ফিরার পর নবী [ﷺ] বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াতপত্র প্রেরণ করেন। তিনি [ﷺ] পত্র লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হয় যে, রাজা-বাদশাহগণ সীলমোহর ছাড়া পত্র গ্রহণ করেন না। তাই তিনি [ﷺ] একটি রূপার আংটি তৈরী করে তার উপর "মুহাম্মাদ, রসূল ও আল্লাহ" এ তিনটি শব্দ দ্বারা ৩ লাইনে খোদায় করে নেন। উপরে প্রথম লাইনে "আল্লাহ" দ্বিতীয় লাইনে "রসূল" আর তৃতীয় লাইনে "মুহাম্মাদ"। নিচ হতে "মুহাম্মাদ, রসূল, আল্লাহ"। নবী [ﷺ] দূত ও পত্রবাহক হিসাবে সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবাগণকে মনোনীত করেন।

রাজা-বাদশাহ্ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণঃ

১. হাবাশা তথা আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীঃ

নবী [ﷺ] আমর ইবনে উমাইয়া জামরীর দ্বারা ৬ষ্ঠ হিজরির শেষে বা ৭ম হিজরির প্রথমদিকে পত্র প্রেরণ করেন। নাজ্জাশীর নাম ছিল:আসহামা ইবনে আবজার। পত্রটি ছিল এমন:

"এটি নবী মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর পক্ষ হতে হাবাশা-আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী-আসহামার নিকট পত্র। যে আল্লাহর হেদায়েত অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনবে তার প্রতি সালাম। আরো সাক্ষ্য দেবে যে, সত্যিকারে ইবাদতের হকদার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, যিনি একক ও তাঁর কোন শরিক নেই। যিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। আর মুহাম্মাদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছি; কারণ আমি আল্লাহর রসূল। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।"

"আল্লাহর নামে, হে কিতাবের আনুসারীগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস- যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না, তাঁর কোন শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।" [সূরা আল ইমরান:৬৪] [বাইহাকী ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন]

পত্রটি পেয়ে নাজ্জাশী তা নিয়ে নিজের চোখের উপর রাখেন এবং সিংহাসন হতে নেমে জাফর ইবনে আবি তালিবের নিকট

ইসলাম গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি নবী [ﷺ]-এর নিকট উত্তরপত্র লিখেন যা নিম্নরূপঃ

বিসমিল্ল্যাহির রহম্যানির রহীম

আল্লাহর রসূল [ﷺ]-এর খেদমতে নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ হতে। হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই।

হে আল্লাহর রসূল! আপনার মূল্যবান পত্রখানা আমার হস্তগত হয়েছেঃ আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের কসম! আপনি ঈসা [عليه السلام]-এর সম্পর্কে যা উল্লেখ কেরছেন তিনি তা হতে এক কণাও অতিরিক্ত ছিলেন না। তিনি [عليه السلام] তেমনি ছিলেন যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন।

আপনি যা কিছু আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আমরা তা অবগত হয়েছি এবং আপনার চাচাত ভাই ও সাহাবাদেরকে মেহমানদারি করেছি।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই আল্লাহর রসূল এবং আপনার ও আপনার চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে বায়েত করলাম ও বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য জাফরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম। [জাদুল মা'আদ:৩/৬১]

সম্রাট নাজ্জাশী তাবুক যুদ্ধের পর ৯ম হিজরির রজব মাসে পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। নবী [ﷺ] তাঁর মৃত্যুর দিন সংবাদ জানতে পারেন এবং তার উপর গায়বানা জানাজার সালাত আদায় করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে যে সিংহাসনে বসেন তার নিকটও নবী [ﷺ] পত্র পাঠান কিন্তু ইসলাম কবুল করেন কি না তা জানা যায়নি।

২. মিশরের সম্রাট মুকাওকেসঃ

নবী [ﷺ] মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট জোরাইজ ইবনে মাতার নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল মুকাওকেস। পত্রটি নিম্নরূপঃ

বিসমিল্ল্যাহির রহম্যানির রহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর পক্ষ থেকে কিবতী (সম্প্রদায়)-এর প্রধান মুকাওকেসের প্রতি।

সালাম তার জন্য যে হেদায়েত অনুসরণ করেন। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে বসবাস করবেন। ইসলাম কবুল করুন আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কিবতীদের পাপ আপনার প্রতি বর্তাবে।

"হে কিতাবের আনুসারীগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না, তাঁর কোন শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।" [সূরা আল ইমরান:৬৪]

এ পত্রের বাহক ছিলেন হাতেব ইবনে বালতা' [رضي الله عنه] তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছে বলেনঃ এই পৃথিবীর উপর আপনাদের পূর্বে এক ব্যক্তি গত হয়ে গেছে যে নিজেই নিজেকে বড় প্রভু মনে করত। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধ্বংস করে আগের ও পরের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং, অন্যের থেকে শিক্ষা গহণ করুন অন্যরা যেন আপনার থেকে শিক্ষা গহণ না করে।

তিনি ইসলাম গ্রহণ না করে নবী [ﷺ]-এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। আর সাথে মারিয়া ও শিরীন নামের দু'টি দাসী ও পরিধানের জন্য কিছু পোশাক ও একটি দুলদুল নামের খচ্চর পাঠান। দুলদুল মু'য়াবিয়া [رضي الله عنه]-এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল। নবী [ﷺ] মারিয়াকে নিজের জন্য রাখেন যাঁর গর্ভে ইবরাহীম [رضي الله عنه] জন্ম লাভ করেন। আর শিরীনকে হাস্‌সান ইবনে সাবেত [رضي الله عنه]কে দান করেন।

৩. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজঃ

বিসমিল্লাাহির রহমাানির রহীম

"এটি আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ [ﷺ]-এর পক্ষ হতে পারস্য সম্রাট কেসরার নিকট পত্র।

যে আল্লাহর হেদায়েত অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনবে তার প্রতি সালাম। আরো সাক্ষ্য দেবে যে, সত্যিকারে ইবাদতের হকদার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, যিনি একক ও তাঁর কোন শরিক নেই। আর মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছি। কারণ, আমি সকল মানুষের জন্য রসূল। যাতে করে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। আর যদি অস্বীকার করেন তাহলে আপনার প্রতি অগ্নি পূজকদের পাপরাশি বর্তাবে।"

এ পত্রের দূত ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী [رضي الله عنه]। তিনি পত্রটি বাহরাইনের প্রধানের নিকট সমর্পণ করেন।

কেসরাকে পত্র খানা পড়ে শোনানো হলে সে রাগান্বিত হয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে এবং অহঙ্কারের সাথে বলে: আমার প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত একজন নিকৃষ্ট দাস তার নিজের নাম আমার নামের পূর্বে লিখেছ?

নবী [ﷺ] এ খবর শুনে বলেন: আল্লাহ যেন তার সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। এরপরে তার ছেলে শিরওয়াই পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে ফেলে।

৪. রোমের সম্রাট কায়সার (হিরাক্লিয়াস):

বিসমিল্ল্যাহির রহম্যানির রহীম

"এটি আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ [ﷺ]-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র।

যে আল্লাহর হেদায়েত অনুসরণ করবে তার প্রতি সালাম। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। ইসলাম কবুল করুন আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আরিসীনদের পাপ আপনার প্রতি বর্তাবে।

"হে কিতাবের আনুসারীগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না, তাঁর কোন শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।" [সূরা আল ইমরান:৬৪]

এ পত্রটির দূত ছিলেন দেহয়া ইবনে কালবী [رضي الله عنه] নবী [ﷺ] তাঁকে পত্রটি বসরার প্রধানের নিকট সমর্পণ করার জন্য নির্দেশ করেন যাতে করে তিনি কায়সারের নিকট পৌঁছে দেন।"

আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াসের মাঝের দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর প্রমাণ করে যে তিনি পত্র পেয়ে প্রভাবিত হয়ে ছিলেন কিন্তু তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করনেনি। তিনি পত্রবাহক দেহয়া কালবীকে অনেক অর্থ সম্পদ ও মূল্যবান পোশাক দ্বারাও পুরস্কৃত করেন। [বুখারী]

৫. **বাহরাইনের গভর্নর** মুনজির ইবনে সাবীর নিকট পত্র। যার দূত ছিলেন 'আলা ইবনে হাযরামী [ﷺ]।

৬. **দামেস্কের গভর্নর** হারেস ইবনে আবি শামর গাসসানীর নিকট পত্র। এ পত্রের বাহক ছিলেন: আসাদ ইবনে খুজাইমা গোত্রের শুজা' ইবনে ওয়াহাব [ﷺ]।

৭. **আম্মানের সম্রাট** জাইফার ইবনে জালান্দী ও তার ভাই আব্দ ইবনে জালান্দীর নিকট পত্র। এর দূত ছিলেন: আমর ইবনে আস [ﷺ]। এ পত্রের দ্বারা গভর্নর ও তাঁর ভাই ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবী [ﷺ] উল্লেখিত পত্রসমূহ দ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। তাদের কেউ কেউ ইসলাম কবুল করেন আর কেউ কেউ অস্বীকার করে। কিন্তু যারা অস্বীকার করে তারাও দ্বীনের ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং নবী [ﷺ]-এর নাম ও দ্বীনকে জানতে পারে।

বিদায় হজ্বের মহাসম্মেলনঃ

দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ পরিপূর্ণ হলো। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার তওহিদ এবং রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর রিসালাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো সাহাবাদের নতুন সমাজটি। ফলে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পার্থিব জীবনের এখানেই বুঝি সমাপ্তি (কারণ রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে)। তাই তিনি মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:)কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বললেন: হে মু'য়ায সম্ভবত এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হয়তো এরপর তুমি আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে।

এ কথা শুনে মু'য়ায (রা:) রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] -এর বিরহ বেদনা হবে স্মরণ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ তা'য়ালা চাচ্ছিলেন তাঁর প্রিয় হাবীবকে দীর্ঘ ২৩ বছরের দু:খকষ্ট এবং নির্যাতনের সুফল দেখাবেন। আরবদের বিভিন্ন গোত্র থেকে মক্কায় হজ্বের সময় জনসাধারণ এবং জন প্রতিনিধিদল সমবেত হবে। অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে দ্বীন-শরীয়তের বিধি-বিধান জেনে নিবে। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁদের থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের আমানত ঠিকমত আদায় করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতের কল্যাণের হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এইরূপ ইচ্ছানুযায়ী রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঐতিহাসিক সেই মাবরূর হজ্বের

ঘোষণা করলেন। বহু মানুষ মদীনায় সমবেত হলো। সকলেই চাচ্ছিল রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আদর্শ তাঁরা মেনে চলবে।

২৫শে যিলকদ শনিবার রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মাথায় তেল মেখে চুল পরিপাটি করে কাপড় পরিধান করলেন ও কুরবানির পশুকে সজ্জিত করলেন। তিনি যোহরের নামাজের পর রওয়ানা হলেন। আসরের সালাতের পূর্বে তিনি যুল হুলাইফা নামক জায়গায় পৌঁছলেন। সেখানে কসর করে আসরের দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। সেখানেই রাত কাটালেন। পর দিন জোহরের সালাতের আগে তিনি ইহরামের জন্য গোসল করে ইহরামের কাপড় লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করলেন। কসর করে জোহরের দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর মোসাল্লায় বসেই হজ্ব ও উমরার একত্রে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়ে বাইরে আসলেন। অত:পর উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন এবং স্বশব্দে তালবিয়া পাঠ করলেন।

৮ দিন সফর করে তিনি মক্কার নিকট এসে পৌঁছলেন। "যী তুওয়া" নামক জায়গায় তিনি রাত্রি যাপন করলেন। অত:পর ফজরের সালাত আদায় ক'রে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন।

দশম হিজরীর যিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখের সকালে তিনি গোসল ক'রে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অত:পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করলেন। কিন্তু হালাল হলেন না; কারণ তিনি কেরান হজ্বকারী ছিলেন এবং সঙ্গে হাদি (হজ্বে কেরান ও তামাত্তু'কারীর জন্য যে পশু জবাই করতে হয় তাকে হাদি বলে) এনে ছিলেন। তওয়াফ এবং সাঈ শেষে তিনি মক্কার সর্বোচ্চ জায়গা "হাজূন" নামক স্থানে

অবস্থান করেন। তিনি এরপরে হজ্বের তওয়াফ ছাড়া আর কোন তওয়াফ করেননি।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে যে সকল সাহাবাগণ সঙ্গে হাদি আনেননি তাঁদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন নিজেদের ইহরাম উমরায় পরিবর্তন ক'রে দেয়। অত:পর বাইতুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার তওয়াফ শেষ ক'রে সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যায়। তাঁরা হালাল হতে আপত্তি করলে[১] তিনি বললেন: আমি যা পরে জেনেছি যদি তা আগে জানতাম তাহলে সঙ্গে হাদি আনতাম না। আমার সঙ্গে যদি হাদি না থাকতো তাহলে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর একথা সাহাবাগণ মেনে নিলেন এবং যাদের সঙ্গে হাদি ছিল না তামাত্তু হজ্বের জন্য উমরা করে তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন।

তারবিয়ার দিন[২] রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে তিনি যোহর থেকে ফজর পর্যন্ত ৫ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। ফজরের সালাতের পর যখন সূর্য উদিত হল, তখন তিনি আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলেন এবং আরাফাতের ময়দানের বাহিরে "নামেরাহ" নামক জায়গায় গিয়ে তাঁবুতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত অবস্থান করলেন। সূর্য ঢলে পড়লে সেখান থেকে বের হয়ে "বাতনে ওরানাহ্" নামক জায়গায় আসলেন।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চতুষ্পর্শ্বে ১,২৪,০০০ বা ১,৪৪,০০০ মানুষের জনসমুদ্র বিদ্যমান ছিল।

---

[১]. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে হাদি থাকার কারণে নিজে হালাল হননি।

[২].যিলহজ্ব মাসের ৮ তারীখের দিনকে তারবিয়ার দিন বলা হয়।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বহুমুখী এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

ভাষণটি হলোঃ

"হে লোক সকল! আমার কথা শোনো, আমি জানি না এ বছরের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারব কি না। তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য আজকের এই দিন, বর্তমান এই মাস, তোমাদের এই শহরের মতই হারাম (নিষিদ্ধ)। জেনে রেখো, জাহেলিয়াতের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হলো। জাহেলিয়াতের সকল খুন (হত্যার মামলা) খতম ক'রে দেয়া হলো। আমাদের মধ্যেকার যে প্রথম হত্যার খুন আমি শেষ করছি তা হচ্ছেঃ রবী'য়া ইবনে হারেছের পুত্রের খুন। এই শিশু বনি সা'দ গোত্রে দুধ পান করার সময় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহিলি যুগের সমস্ত সুদ কারবার খতম করা হলো। আমাদের মধ্যেকার যে সুদ আমি খতম করছি তা হলোঃ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ কারবারি শেষ ক'রে দেয়া হলো।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের জন্য মঙ্গল কামনা কর। কেনানা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আমানত ও অঙ্গিকার দ্বারা গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ তা'আলার কালেমার মাধ্যমে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকারঃ তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে না দেয় যাদের

তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমরা তাদেরকে প্রয়োজনে হালকা প্রহার করতে পার। কিন্তু রক্ত ঝরে এমন কঠোর প্রহার করবে না। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে: তোমরা যা পানাহার করবে তা তাদেরকে করাবে এবং নিজেরা যে ধরণের পোশাক পরবে সেরূপ তাদেরকেও পরাবে।

তোমাদের নিকট আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত। [কিছু সহীহ বর্ণনাতে বিদায় হজ্বে ভাষণে সুন্নতের কথাও উল্লেখ হয়েছে]

হে লোক সকল! জেনে রেখো আমার পরে কোন নবী আসবে না। আর তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের এবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। রমজান মাসের রোজা রাখবে। আনন্দ চিত্তে নিজের ধন-সম্পদের জাকাত প্রদান করবে। নিজ প্রতিপালকের কা'বা ঘরের হজ্ব পালন করবে। নিজেদের শাসকদের আনুগত্য করবে। উপরোক্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি কি আল্লাহর রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা কি জবাব দিবে? সাহাবা কেরাম যৌথকণ্ঠে বললেন: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নি:সন্দেহে আপনি অহির তবলীগ করেছেন, পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন ও নসিহত করেছেন।

একথা শুনে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজ শাহাদত আঙ্গুল আসমানের দিকে উঠিয়ে লোকদের দিকে ঝুকিয়ে তিনবার বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ভাষণ শেষ করার পর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাজিল হয়।

U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং (একমাত্র) ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম।” [সূরা মায়েদা:৩]

আয়াত শুনে উমার (রা:) কাঁদতে শুরু করলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন কাঁদছো? তিনি বললেন: আমরা দ্বীনের পরিপূর্ণতায় আছি। আর পরিপূর্ণতার পর তো শুধু অপূর্ণতাই বাকি থাকে। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: ঠিকই বলেছ।

খুৎবা শেষে বেলাল [রা:] আজান দেন। এরপর দুই একামতে যোহর ও আসরের সালাত কসর করে একত্রে আদায় করেন। আর এর মাঝে কোন প্রকার সুন্নত বা নফল সালাত আদায় করেননি। অত:পর উটের উপর আরোহণ করে আরাফাতের অবস্থানের স্থানে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

এরপর বাহনের পিছনে উসামা ইবনে হারেছাহ [রা:]কে নিয়ে মুজদালা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম এক আজান ও দুই একামতে মাগরিব ও কসর করে এশা সালাত আদায় করেন। এরপর কোন ইবাদত না করে রাত্রে ঘুমিয়ে

পড়েন। ফজরের সালাতের পর মাশ'আরুল হারামে গিয়ে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে দোয়া করতে থাকেন।

এরপর বাহনের পিছনে ফাযল ইবনে আব্বাস [ﷺ]কে নিয়ে মিনার দিকে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে জামরাতুল আকবাতে আল্লাহু আকবার বলে একে একে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। এরপর ১০ তারিখের বাকি কার্যাদি সম্পাদন করেন।

বিদায় হজ্বে নবী [ﷺ] মোট ১০০টি উট কুরবানি করেন। এর মধ্যে তিনি নিজ হাতে জবাই করেন ৬৩টি যা তাঁর ৬৩ বছর বয়সের সমান। তিনি যখন উট জবাই আরম্ভ করেন তখন উটগুলো প্রতিযোগিতা শুরু করে, কে আগে নবীর সামনে গিয়ে জীবন দেবে। আর বাকিগুলো জবাই করেন আলী [ﷺ]।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কুরবানির দিন (১০ই যিলহজ্ব তারিখে)ও একটি ভাষণ দেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু বকর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরবানির দিন রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন: "যুগ আবর্তিত হয়ে বর্তমানে ঠিক সেই দিনের আকৃতিতে (হিসাবে) এসে পৌঁছেছে, যে দিন আল্লাহ আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চার মাস হচ্ছে হারাম (নিষিদ্ধ) মাস। তিনটি মাস যথাক্রমে: যিলকদ, যিলহজ্ব ও মুহাররম। আর অপরটি মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদিস সানি ও শাবান মাসের মাঝে।

এরপর নবী [ﷺ] বলেন: এটি কোন মাস? সাহাবাগণ বলেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। অত:পর তিনি চুপ করে থাকেন এতে সাহাবাগণ মনে করেন হয়তো তিনি অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি [ﷺ] বলেন: এটি কি যিল হজ্ব মাস নয়? তাঁরা

বলেন: হ্যাঁ। তিনি বলেন: এটি কোন শহর? তাঁরা বলেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। অত:পর তিনি চুপ করে থাকেন এতে সাহাবাগণ মনে করেন হয়ত তিনি অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি বলেন: এটি হারাম শহর নয়? তাঁরা বলেন: হ্যাঁ। তিনি বলেন: এটি কোন দিন? তাঁরা বলেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। অত:পর তিনি চুপ করে থাকেন এতে সাহাবাগণ মনে করেন হয়ত তিনি অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি বলেন: এটি কুরবানির দিন নয়? তাঁরা বলেন: হ্যাঁ। তিনি বলেন: নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান এ দিন, এ শহর ও এ মাসের ন্যায় হারাম।

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। এতএব, আমার অবর্তমানে তোমরা ভ্রষ্টতাতে ফিরে যেয়ে একে অপরের গর্দান মারবে না।

সাবধান! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? তাঁরা বলেন: হ্যাঁ। তিনি বলেন: হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। তিনি আরো বলেন: উপস্থিত জনগণ অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছে দেবে। কারণ, কিছু সরাসরি শ্রোতা থেকে গ্রহণকারী কিছু অনুপস্থিত ব্যক্তি বেশি সংরক্ষণকারী।"

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাত্র একবার হজ্ব পালন করেন। আর উমরা করেন চারটি। হজ্ব শেষে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

দা'ওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

দা'ওয়াত ছিল তাঁর জীবনের নির্যাস ও সর্বোত্তম কাজ। অন্যান্য নবী-রসূলদের থেকে যা দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছিলেন তা ছিল দা'ওয়াত। তাই তো আল্লাহ তা'য়ালা আগের ও পরের সবার নেতৃত্বের মুকট তাঁর মাথার উপর স্থাপন করেছিলেন।

নবী [ﷺ]-এর নবুয়াত শুরু হয় "ইক্‌রা'" দ্বারা এবং রিসালাত আরম্ভ হয় "ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফাআনযির" দ্বারা। তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আমানতের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে দীর্ঘ ২০বছরের বেশি অনবরত দণ্ডায়মান রইলেন। ইহা ছিল সকল মানব জাতির দায়িত্ব, সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের বোঝা এবং বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ ও অবিরাম সাধনা।

সমাজ ছিল জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী ভাবধারায় ছিল দারুণভাবে ভারাক্রান্ত এবং পশু প্রবৃত্তি ও লোভ লালসার বেড়াজালে ছিল আবদ্ধ।

এমতাবস্থায় একদল বিশেষ বিবেক সম্পন্ন, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ সাহাবা কেরামের সহযোগিতায় সবকিছুকে পরাভূত ও ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। আর অহির ধ্যান-ধারণা ও আলোর সমুজ্জল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন তখন আরম্ভ হলো ভিন্নতর এক জীবন ধারা।

আরম্ভ হলো যুদ্ধের পর যুদ্ধ। সেই সকল শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর দা'ওয়াত এবং তাঁর বিশ্বাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। বিরোধীরা শিশু ইসলামের বীজটি ভূগর্ভে তার শিকর মজবুত করুক এবং তার ডালপালা

উন্মুক্ত আকাশে বিস্তার করুক চাচ্ছিল না। বরং সমূলে ধ্বংস করার নিমিত্বে তারা তাদের সর্বপ্রকার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছিল।

নবী [ﷺ]কে তাদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল এবং আরব উপদ্বীপের কাফের-মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোম বাহিনী এই নতুন উম্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া আরম্ভ করে দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরেক, মুনাফেক ও কাফেরদের সঙ্গেই যে নবী [ﷺ]কে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল তাই নয় বরং আরও এক ভয়ঙ্কর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সাথে তাঁকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। আর সে হলো মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে মানুষকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে। কিন্তু নবী [ﷺ] তাঁর দারুণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে সে সবের মুকাবিলা করে সবকিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবা কেরাম যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসকিতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিজেদের নিয়েজিত করেছিলেন মানব ইতিহাসে তার কোন নজির ও তুলনা পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা নবী [ﷺ]-এর উপর দ্বীনের দা'ওয়াতের যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে ছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সাহাবাগণ এত বেশি সচেতন এবং চিন্তান্বিত থাকতেন যে নিজেদের নিয়ে চিন্তা করার কোন অবকাশ থাকত না। দ্বীনের তা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য

তাঁরা নিজেদের জানমাল কুরবানি করতে কোন প্রকার দিধা-দ্বন্দ্ব করতেন না। দ্বীনের কাজে তাঁরা অকাতরে প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে একদম নি:স্ব হয়ে যেতে কখনই কুণ্ঠিত হতেন না। নবী [ﷺ]-এর হাতে যখন সঞ্চিত হত সম্পদের পাহাড় সেসব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন না। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ধন-সম্পদ ছিল অকাম্য এবং দারিদ্র ছিল কাম্য। দিনের বেলা দ্বীনের দা'ওয়াত ও রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন এবং রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।

নবী [ﷺ] এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন করতে পারেনি। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বহু প্রতিকুলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামি দা'ওয়াত এক বিশাল কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ববাসীর বিবেক একেবারে স্তম্ভিত ও হতভম্ভ হয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হল। রোগাক্রান্ত বিবেকগুলো সুস্থ হলো যার ফলে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং তাওহীদের প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আর সর্বত্র মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি দিগ্বিদিগ মুখরিত করে ফেলল। কুরআন তেলাওয়াতের মধুর সূর যেখানে সেখানে মউ মউ করতে শুরু করল ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হতে লাগল।

বিভিন্ন ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বহুবিভক্ত গ্রোত্রগুলোর মাঝে ঐক্য, সহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে লাগল।

মানুষের গোলামী থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ একমাত্র আল্লাহর গোলামী করতে আরম্ভ করল। থাকল না আর কোন প্রকার জালেম ও মাজলুম। রইল না মনিব ও দাস এবং শাসক ও শাসিত। বরং সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহর বান্দা। সবাই ভাই ভাই একে অপরকে ভালবাসা এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করাই তাদের কাজ। আল্লাহ তা'য়ালা জাহেলিয়াতের সকল ভেদাভেদের অবসান ঘটালেন। কোন আরবের অনারবের প্রতি ও অনারবের আরবের প্রতি কিংবা সাদা মানুষের কালোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রইল না। বরং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো একমাত্র তাকওয়া। মানুষ সকলে আদমসন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি।

এই দা'ওয়াতের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো আরবদের ঐক্য, মনবতার ঐক্য, সামাজিক ইনসাফ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির দুনিয়াবি সমস্যার সমাধান এবং পরকালের কল্যাণের সঠিক নির্দেশনা। মানুষের জীবনধারায় সূচিত হলো আমূল পরিবর্তন। জমিনের চেহারা পালটে গেল এবং নতুন ইতিহাস রচিত হলো ও পরিবর্তন হলো চিন্তা-চেতনা।

ইসলামি দা'ওয়াতের আগে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে ডুবে ছিল। পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত ও আত্মা ছাড়িয়ে চলছিল দুর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজ করছিল অন্যায়, মানুষের গোলামি, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস-প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফুর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান হয়ে পড়েছিল

বিকৃত এবং বিভ্রান্তপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহীন একটি লোকাচার বা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামী দা'ওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাকশক্তি, সর্ববাদীসম্মত ঐশী বিধিবিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবন বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে যে অর্থহীন লোকাচার, মত-বিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্ববাদী, বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উন্নতি ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সূচিত হল ইতিপূর্বে কোন কালেও যা দেখা যায়নি।
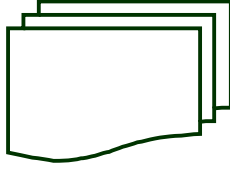
প্রিয় হাবীব তাঁর উম্মতকে এতিম বানালেন

@ উপরের বন্ধুর ডাকে সাড়াঃ

হজ্ব থেকে ফিরে আসার ৮১ দিন পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন অসুখ বাড়তে থাকে। অসুস্থতার কারণে যখন ইমামতী করতে অপারগ হলেন তখন আবু বক্‌র (রা:)কে লোকদের ইমামতী করতে বললেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের উপর অভিশাপ করে বলেনঃ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। অতএব, তোমরা আমার কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না। আর সর্বশেষ অসিয়াত করেনঃ তোমরা নামাজ কায়েম করবে এবং দাস-দাসীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।

১১হিজরীর ১২ই রবীউল আওয়াল তালিখে রোজ সোমবার রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রফীকে আ'লা তথা উপরের বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সবাইকে এতিম বানিয়ে আখেরাতে পাড়ি জমালেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩বছর।

সাহাবাদের নিকট খবর পৌঁছলে তাঁরা চেতনা হারাতে বসেন এবং তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে উমার ফারুক [ﷺ] কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করেন, যে বলবে প্রিয় হাবীব মারা গিয়েছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেব। তিনি আবেগে পড়ে নবীজির মৃত্যুর কথা মেনে নিতে পারছিলেন না।

এমন সময় আবু বক্‌র (রা:) তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুঝালেন যে, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ। তাই তিনিও তাদের মত মরণশীল। আবু বক্‌র

(রা:) আরো বললেন: যে ব্যক্তি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পূজা করতো সে যেন জেনে নেই যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আর জীবিত নেই। আর তোমাদের মধ্যেকার যারা আল্লাহ তা'আলার এবাদত করতো তাঁরা যেন জানে যে, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পাঠ করেন:

R Q P O N M K J I H G F E D C [

` _ ^] \ [Z Y X W V U S

Z a آل عمران: ١٤٤

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পুন:রায় পিছনে (কুফরিতে) ফিরে যাবে? আর সত্যিই যদি কেউ পিছনে (কুফরিতে) ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না (বরং সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে)। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদেরকে শীঘ্রই প্রতিদান দিবেন।" [সূরা আল ইমরান:১৪৪]

আবু বক্র (রা:) এর এই ভাষণে মানুষ শান্ত হলো।

অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে গোসল করিয়ে ইয়ামেনের ৩টি সুতি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়, যার মধ্যে কামীস (জামা) ও পাগড়ি ছিল না। মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বে মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা:)-এর হুজরা শরীফে কবর খনন করে বুধবারের রাতে মহানবী [ﷺ]কে দাফন করা হয়। কবরে যাঁরা নেমে ছিলেন তাঁরা হলেন: আলী ইবনে আবি তালিব, ফজল ইবনে আব্বাস, কুছাম ইবনে আব্বাস এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-

এর মাওলা (আজাদকৃত গোলাম) শাকরান [ﷺ]। আর ইমাম নববী (রহ:) আব্বাস [ﷺ] ও সঙ্গে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

নবী [ﷺ]-এর জানাজার নামাজ জামাত করে হয়নি। বরং যথাক্রমে: পুরুষ, নারী, ছোট এবং দাস-দাসীরা যার যার মত জানাজা পড়েন। [বেদায়া-নেহায়া-ইবনে কাসীর:৫/২৩২]

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নবুয়াতের পূর্বে ৪০বৎসর এবং পরে ২৩ বৎসর জীবন যাপন করেন। নবুয়াতের ২৩বছরের মধ্যে মক্কায় ছিলেন ১৩বছর আর মদীনায় ছিলেন ১০বছর।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মৃত্যুর পর মুসলিমগণ আবু বকর (রা:)কে তাঁদের খলীফা নিযুক্ত করেন। আর তিনিই ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের সর্বপ্রথম খলীফা।
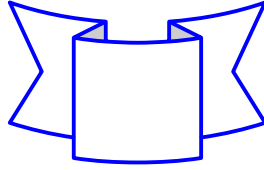
@ হক ও বাতিলের লড়াই

@ ছোট দলের বিজয়

@ পরাজয়ের কারণ

@ আল্লাহর সেনাদল

@ সুস্পষ্ট মহান বিজয়

@ তাদের সকাল বেলা মন্দ

সারায়াহ্ ও গাজাওয়াত

. মদীনার পরিবেশঃ

মদীনায় চার প্রকার মানুষ বসবাস করত। মুসলমান, মুনাফেক, মুশরেক ও ইহুদি। আর ইহুদিদের গোত্র ছিল তিনটি । বনি কয়নুকা', বনি নাযীর ও বনি কুরায়যা। ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী। ইহুদিরা অঙ্গীকার ভঙ্গে ও কুচক্রান্তে এবং জঘন্য চরিত্রে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে তাদের নোংরামির কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

১. আল্লার এবাদতে শিরক করা। [সূরা তাওবা:৩০-৩১]
২. নবী-রসূল ও সৎ লোকদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা। [সূরা বাকারা:৬১]
৩. অহির জ্ঞানকে গোপন ও সত্যকে পরিবর্তন করা। [সূরা বাকারা:৫৮ ও সূরা মায়েদা:৬৮]
৪. দলাদলি ও মতানৈক্য সৃষ্টি করা। [সূরা হাশর:১৪]
৫. সুদ কারবারি করা। [সূরা মায়েদা:৪২]
৬. মুনাফেকি তথা বাহির ও ভিতরের গড়মিল প্রদর্শন। [সূরা বাকারা:১৪-১৫]
৭. চাটুকারিতা ও মোসাহেবি করা। [সূরা মায়েদা:৭৮-৭৯]
৮. জ্ঞান দ্বারা উপকৃত না হওয়া ও জানার পরেও আমল না করা। [সূরা জুমু'আ:৫]
৯. সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো। [সূরা বাকারা:১০৯]
১০. প্রতারণা ও অহংকার করা। [সূরা বাকারা:১১১ ও মায়েদা:১৮]
১১. কার্পণ্যতা করা। [সূরা নিসা:৩৯]

১২. অবাধ্যতা ও হটকারীতা করা। [সূরা বাকারা:১৪৫ ও সূরা ইউনুস:১০১]

• যুদ্ধের অনুমতিঃ

মদীনার ইহুদিদের সঙ্গে কুরাইশদের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। তাই তারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উস্কানি দিত। যেমনভাবে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে সমূলে বিনাশের হুমকিও দিত। এভাবে মুসলমানদেরকে ভিতরে-বাহিরে চারিদিক থেকে আশঙ্কা ঘিরে ফেলে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছালো যে, সাহাবা কেরাম [ﷺ] তলোয়ার নিয়ে ঘুমাতেন।

ঠিক এমন একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের অনুমতি নাজিল করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সামরিক মিশন ঠিক করতে শুরু করলেন। যাদের কাজ হবে শত্রুদের অবস্থান নির্ণয় করা এবং তাদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর চাপ সৃষ্টি করা। যেন তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানরা শক্তিশালী। আর মুসলমানরা যেন কোন বিরোধীতা ছাড়াই স্বাধীনভাবে আল্লাহর এবাদত করতে পারেন এবং দ্বীনের দা'ওয়াত ও তবলীগের সুযোগ পায়। এমনিভাবে কোন কোন গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের মৈত্রী চুক্তিও সাক্ষরিত হয়।

• জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জিহাদের উদ্দেশ্য নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা নয়। বরং জিহাদের সুমহান অনেক লক্ষ্য ে উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমনঃ

১. আল্লাহর জমিনকে সম্পূর্ণভাবে শিরকমুক্ত এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। [সূরা আনফাল:৩৯-৪০]

২. স্বাধীনভাবে আল্লাহর এবাদত করার পরিবেশ সৃষ্টি ও দ্বীনি নির্দশনাবলীর সংরক্ষণ। [সূরা হাজ্ব:৩৮-৪১]
৩. পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার ফ্যাসাদ-বিপর্যয় দূর করা। [বাকারা:২৫০-২৫২]
৪. ঈমানী পরীক্ষা, ইসলামি তরবিয়ত (প্রতিপালন) ও আত্মার সংশোধন ও পবিত্র করা। [সূরা মুহাম্মদ:৪-৬ ও সূরা আল ইমরান:১৪২]
৫. কাফেরদেরকে লাঞ্জিত ও অপমানিত করা এবং তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পণ্ড করা। [সূরা আনফাল: ৬০, ১৭-১৮ ও তাওবা:১৫]
৬. মুনাফেকদের মুখোশ উম্মোচন করা। [সূরা আল ইমরান:১৭৯]
৭. জমিনে আল্লাহর বিধিবিধান কায়েম করা। [সূরা নিসা:১০৫]
৮. কাফেরদের শত্রুতা দূর করা। [সূরা নিসা:৭৪-৭৫ ও সূরা বাকারা:১৯০-১৯২]

• সৈন্য অভিযান ও যুদ্ধঃ

মদীনার নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুশরেকরা যুদ্ধ ঘোষণা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নতার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এমন মুহূর্তে যুদ্ধের অনুমতি নাজিল হয়। তাই আত্মরক্ষার্থে ও দেশের নিরাপত্তা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের মুসলিম সেনাদলের শক্তি প্রমাণের জন্য বিভিন্ন সৈন্য অভিযান ও যুদ্ধ চালানো জরুরি হয়ে পড়ে।

যে সকল সৈন্যদল নবী [ﷺ]-এর নির্দেশে অভিযান চালায় এবং তিনি তাতে নিজে অংশ গ্রহণ করেননি তাকে সারায়াহ ও বা'ছাহ বলে। চাই তাতে যুদ্ধ সংঘটিত হোক বা না হোক। এগুলোর সংখ্যা ইবনে ইসহাক (রহ:) ৩৮টি উল্লেখ করেছেন। আর যে সকল যুদ্ধে নবী [ﷺ] নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন

সেগুলোকে গাজাওয়াত বলে। চাই তাতে যুদ্ধ সংঘটিত হোক বা না হোক। এর সংখ্যা ইবনে হেশাম (রহ:) ২৭টি বলেছেন। আবার ইবনে হাজম (রহ:) বলেছেন ২৫টি। আর কেউ বলেছেন ২৪টি বা ২১ টি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) বলেছেন: ১৯টি। এর মধ্যে ৯টি গাজাওয়াতে তিনি [ﷺ] সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। সেগুলো যথাক্রমে: বদর, ওহুদ, খন্দক, কুরায়যা, মুস্তালেক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ। এখানে প্রসিদ্ধ কিছু গাজাওয়াতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

- **বদরের যুদ্ধ:**

প্রায় ৫০হাজার দীনারের বিশাল মাল-সম্পদ নিয়ে কুরাইশদের একটি কাফেলা শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরতেছিল। এই ব্যবসার লভ্যাংশের সিংহ ভাগ দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি বড় সুযোগ যে, মক্কাবাসীকে এমন একটি অর্থনৈতিক মার দিবে যার ব্যথা ওদের হৃদয় থেকে কখনো দূর হবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শক্তি-সামর্থ্য হারাবে।

তাই রসূলুল্লাহ [ﷺ] এই বাণিজ্য কাফেলাটির গতিরোধের দৃঢ় সংকল্প করলেন এবং মাত্র ২টি ঘোড়া এবং ৭০টি উটসহ ৩১৩ জনের এক বাহিনী নিয়ে বের হলেন। এদিকে কুরাইশদের কাফেলায় ছিল ১০০০উট। কিন্তু তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০জন। কাফেলাটির পরিচালক ছিল আবু সুফিয়ান। সে মুসলমানদের মদিনা থেকে বের হওয়ার খবর জানতে পেরে মক্কাবাসীকে ব্যাপারটা অবহিত করিয়ে তাদের নিকট সাহায্য প্রর্থনা ক'রে। আর রাস্তা পরিবর্তন ক'রে অন্য পথে চলে যায়।

ফলে মুসলমানগণ তাদের গতিরোধের ব্যাপারে কামিয়াব হলো না।

ওদিকে কুরাইশরা ১৩০০যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যের জন্য বের হয়। কিন্তু আবু সুফিয়ানের দূত এসে তাদের কাফেলার নিরাপদে পরিত্রাণের খবর দেয় এবং তাদেরকে মক্কায় ফিরে যেতে বলে। কিন্তু আবু জাহ্‌ল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং সেনাবাহিনীসহ বদর প্রান্তে এসে পৌঁছে। কিন্তু ওদের মধ্য হতে ৩০০ শত যোদ্ধা মক্কা ফিরে যায়।

এদিকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] কুরাইশদের বের হওয়ার খবর জানতে পেরে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং সবাই কাফেরদের মুখোমুখি হওয়ার ও তাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে ঐক্যমত পোষণ করেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান জুমার দিন সকালে উভয় দলের সঙ্গে তুমুল লড়াই হয়।

এ যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার এরপর তিন হাজার এবং শেষে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করেন। ফেরেশতাগণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। [সূরা আনফাল: ৯ এবং সূরা আল ইমরান: ১২৪-১২৫ আয়াত দ্রষ্টব্য]

এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয় এবং মাত্র ১৪জন সাহাবী শহীদ হন। আর কাফেরদের নিহত হয় ৭০জন। যাদের মধ্যে ছিল কুরাইশদের বড় বড় নেতারা। বিশেষ ক'রে এই উম্মতের ফেরাউন আবু জাহ্‌ল। ওদের যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যাও ছিল ৭০জন।

এই যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কন্যা উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা:)-এর স্ত্রী রোকাইয়া (রা:) মৃত্যুবরণ করেন। রোকাইয়ার অসুস্থতার কারণে রসূলুল্লাহ [ﷺ] উসমান (রা:)কে তাঁর

সেবায় রেখে যান। তাই তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ [ﷺ] উসমান (রা:)কে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা উম্মে কুলছূমের সাথে বিবাহ দেন। তাই উসমান ইবনে আফফান(রা:)কে যুননূরাইন বলা হয়। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

যুদ্ধের পর মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের জন্য আনন্দে মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল গণিমতের মাল[১] মাল[১] এবং যুদ্ধবন্দীরা। বন্দীদের কেউ মুক্তিপণ দিয়ে আর কেউ ফিদিয়া ছাড়া ১০জন করে মুসলিম সন্তানদের লেখা-পড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তিলাভ করে।

. ওহুদের যুদ্ধঃ

মক্কাবাসীরা বদর প্রান্তের লজ্জাজনক পরাজয়ের কারণে ক্রোধের আগুনে জ্বলছিল। তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধের প্রবণতা টগ্‌বগ করছিল। তাই তাদের ক্রোধ এবং বিদ্বেষ মিটানোর জন্য বদরের পর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করতে লাগল। পরিশেষে হিজরী সনের তৃতীয় সালে মক্কায় পরিকল্পিত এক বিশাল বাহিনী তৈরী করল কুরাইশরা। যার মধ্যে কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও হাবশীরা মিলে ছিল ৩০০০যোদ্ধা। ৩০০উট, ২০০অশ্বরোহী এবং ৭০০লৌহ বর্ম।

এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল আবু সুফিয়ান। অশ্ববাহিনীর কমান্ডার ছিল খালেদ বিন ওয়ালিদ এবং তার সহযোগিতায় ছিল

[১].যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গণিমতের মাল বলা হয়। আর বন্দীপণকে ফিদিয়া বলে।

ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল। আর ঝাণ্ডা ছিল বনি আব্দুর-দারের কাছে। মক্কার বিশাল বাহিনী মদীনার দিকে চলতে শুরু করল।

এদিকে মক্কায় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) কুরাইশদের সামরিক প্রস্তুতি ও তাদের অবস্থান নির্ণয় করতেছিলেন। তাই তিনি কুরাইশী সেনাবাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ভাতিজা মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে অতি দ্রুত একটি চিঠি পাঠালেন। এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] কুবা মসজিদে ছিলেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা:) তাঁকে চিঠি পড়ে শুনালেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে চিঠির খবর গোপন রাখতে নির্দেশ দিলেন এবং দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে আনসার এবং মুহাজিরদের প্রধানদের সাথে মত বিনিময় ক'রে জরুরিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

মুসলমানদের টহলবাহিনী শত্রুর অবস্থান নির্ণয় করতে থাকলেন। এদিকে মক্কার বাহিনী মদীনায় এসে পৌঁছলো এবং তারা ওহুদ পাহাড়ের পার্শ্বে সেনাশিবির তৈরী করল। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরীর জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি সামরিক পরামর্শ বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে যুদ্ধের অবস্থান নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো: মদীনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য।

অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] জুমার নামাজ আদায় করে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সবাইকে সার্বিক প্রচেষ্টা ও আত্মনিয়োগের জন্য নির্দেশ করলেন। তিনি তাঁদেরকে ধৈর্যধারণের শর্তে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন এবং শত্রু দলের মোকাবেলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন।

পরিশেষে তিনি ১০০০জন যোদ্ধাসহ ওহুদের দিকে রওয়ানা হলেন।

পথে মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বিদ্রোহ ক'রে প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩০০ শত) সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসল। বাকি সৈন্য নিয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ] ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং সেখানেই সৈন্যশিবির স্থাপন করলেন। সামনে মদীনা এবং পিছনে দীর্ঘ ও লম্বা ওহুদ পাহাড়।

এবার সামরিক বাহিনী থেকে পারদর্শী এক তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করলেন, যাদের সংখ্যা ছিল ৫০জন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা:)কে এদের কমান্ডার বানিয়ে "ওয়াদী কানাত" বা কানাত উপত্যকার উত্তর পার্শ্বের পাহাড়ের উপর তাদেরকে অবস্থান নিতে নির্দেশ করলেন। এই পাহাড়টি বর্তমানে "জাবালুর রুমাত" বা তীরন্দাজদের পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] তীরন্দাজ (বিমান) বাহিনীকে বললেন: তোমরা শত্রুদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পেছন দিক থেকে আমাদের উপর হামলা করতে না পারে। আমাদের বিজয় হোক বা পরাজয় হোক সর্বাবস্থায় তোমরা নিজ অবস্থানে অবিচল থাকবে। আমাদের পেছনের দিক তোমরা হেফাজত করবে। যদি দেখ যে, আমরা গণিমতের সম্পদ সংগ্রহ করছি তবুও আমাদের সাথে তোমরা অংশ নিবে না।

অবশিষ্ট বাহিনীদেরকেও রসূলুল্লাহ [ﷺ] বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন। আর মসু'আব ইবনে 'উমাঈর (রা:)কে পতাকা প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সেনা বিন্যািসের এ পরিপল্পনা ছিল অতি সূক্ষ্ম এবং কৌশলপূর্ণ। এতে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সামরিক নেতৃত্বে বিরাট প্রতিভা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উভয় দলই নিকটবর্তী হলো ও শুরু হলো ভীষণ লড়াই। উত্তপ্ত হলো রণক্ষেত্র। যুদ্ধে মুশরিকদের উপর কঠিন অবস্থা বিরাজ করছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে গেল। মুসলমানদের ছোট বাহিনীটি সর্বদিক থেকে ওদের উপর চাপ সৃষ্টি করল। ফলে কুরাইশরা ভাগতে শুরু করল। আর মুসলমানগণ তাদের উপর হামলা ক'রে তাদের থেকে গণিমতের সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল।

এদিকে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশই মুসলমানদের বিজয় দেখে তাঁদের সঙ্গে গণিমতের মাল সংগ্রহে ঝাপিয়ে পড়লেন। যদিও তাঁদের আমীর তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: তোমরা কি ভুলে গেছো! রসূলুল্লাহ [ﷺ] তোমাদেরকে কি বলেছিলেন? আর এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খালেদ বিনি ওয়ালীদ। সে এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে দ্রুত জাবালে রুমাত দিয়ে মুসলমানদের বাহিনীর পশ্চাদভাগে গিয়ে পৌঁছল।

যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়ে গেল। মুশরিকরা চারিদিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল ও কঠিনভাবে তাঁদের উপর হামলা চালাতে লাগল। ফলে পরাজিত হতে হলো মুসলমানদেরকে। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নীচের ডান মাড়ির "রাবাইয়া"[১] দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং মাথায় ক্ষত হলো। রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ কাফের ও মুসলিম সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

পরিশেষে ৭০জন মুসলমান শহীদ হলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাইয়িদুশশুহাদা' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ

---

[১] .মুখের অগ্রভাগের উপরে এবং নিচের দু'টি করে চারটি বড় দাঁত সংলগ্ন দু'টি ক'রে উপর- নিচের চারটি দাঁতকে "রাবাইয়া" বলা হয়।

আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা:)। তিনি হলোন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর চাচা। তাঁকে বর্শা দ্বারা হত্যা করে ওয়াহ্‌শী ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'য়িম।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] ওহুদের শহীদদেরকে নিজ নিজ শাহাদতের জায়গাতেই দাফন করলেন। মুসলমানদের অনেকই আহত হলেন। কাফেরদের মধ্যে থেকে নিহত হয়েছিল ৩৭জন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এর শুধুমাত্র একটি নির্দেশ অমান্যই ছিল এ পরাজয়ের মূল কারণ। আজ-কাল মুসলমানরা মহানবী [ﷺ]-এর হিসাবহীন নির্দেশ অমান্য করে চলছে। যার ফলে তাদের ভাগ্যে পরাজয়, নির্যাতন, দেশ থেকে বিতাড়িত ছাড়া ভাগ্যে আর কিছুই জুটছে না।

. আহ্‌জাব ও খন্দকের যুদ্ধঃ

ওহুদের যুদ্ধের পর একদল ইহুদি মক্কা গিয়ে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানী দেয় এবং তাদেরকে যুদ্ধে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে। তাদের এ প্রস্তাবে মক্কাবাসীরা সম্মতি দেয়। অন্যদিকে ইহুদিরা তাদের পক্ষের অন্যান্য গোত্রকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাথ দেওয়ার জন্য উত্তেজিত করে এবং তারা সাথ দেয়। আর এভাবে ইহুদি কমান্ডার ও নেতারা কাফেরদের সকল দলকে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাাম] ও মুসলমরনদের বিরুদ্ধে জমায়েত করে। এ জন্যই এ যুদ্ধের নাম "গাজওয়াতুল আহজাব" অর্থাৎ বহু দলীয় যুদ্ধ। কেননা, কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে একত্রিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে এ যুদ্ধের নাম "গাজওয়াতুল খান্দাক" অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ। কারণ, মুসলিম সৈন্যগণ কাফেরদের প্রতিরোধ করার জন্য পরিখা খনন করেন।

সঠিক মতে হিজরী সনের পঞ্চম সনে শাওয়াল মাসে মুশরিকরা এবার সর্বদিক থেকে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। মদীনার চারদিকে কাফেরদের প্রায় দশ হাজার সৈন্য জমায়েত হয়। রসূলুল্লাহ [ﷺ] শত্রুদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ চাইলে সালমান ফার্সী (রা:) তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, মদীনার যে পার্শ্বে পাহাড় নেই সে পার্শ্বে পরিখা খনন করা হোক।

গৃহীত হলো পরামর্শটি। দ্রুত খননের কাজ শেষ হওয়ার নিমিত্তে মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করলেন। নবী [ﷺ] নিজেও পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় এক মাস অপেক্ষা করেও মুশরিকরা পরিখা ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ডুকতে পারল না। অত:পর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের উপর প্রচণ্ড বেগে ঝড়ো হাওয়া পাঠালেন। ঝড় ওদের তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলল। ফলে তারা ভীত হয়ে সবাই দ্রুত যার যার ঘরে ফিরে গেল।

. হোদায়বিয়ার সন্ধিঃ

মদীনায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি ও সাহাবা কেরাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন। তিনি কা'বা ঘরের চাবি নিয়েছেন এবং সাহাবাগণসহ কা'বা ঘর তওয়াফ ও উমরা পালন করছেন। এরপর কিছু সাহাবা চুল মুণ্ডন করেন আর কিছু চুল কাটেন। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদের এ স্বপ্নের কথা জানালে সাহাবাগণ শুনে খুব খুশী হলেন। তাঁরা মনে করলেন যে, এ বছরই মক্কায় প্রবেশ করা সম্ভব হবে। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদের এ কথাও জানালেন যে, তিনি উমরা পালন করবেন। এরপর সাহাবা কেরাম সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ১৪০০ (চৌদ্দশ) জন সাহাবাদের সাথে নিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসের শুরুতে রোজ সোমবার মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সাথে মুসাফের সুলভ কোষবদ্ধ তলোয়ার নিলেন।

যুল হোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ও সাহাবাগণ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। অত:পর তাঁর সফর অব্যহত রাখলেন এবং এক পর্যায়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে অবতরণ করেন।

ওদিকে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর রওয়ানার খবর শুনে এক জরুরি পরামর্শ সভার বৈঠক বসালো এবং এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যে কোন মূল্যে মুসলমানদের বায়তুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে হবে।

এদিকে নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা:)কে দূত হিসাবে কুরাইশদের নিকট এ পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি শুধুমাত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে এসেছেন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য নয়।

কুরাইশরা উসমান (রা:)কে তাদের নিকট আটক রাখলে মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর শুনে নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উসমান (রা:)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি তাঁর মোবারক হাত দিয়ে কুল বৃক্ষের নীচে “বাই‘আতুর রিযওয়ান” নামক বায়েত গ্রহণ করেন। ওদিকে বায়েত শেষে উসমান (রা:) মক্কা থেকে নিরাপদে ফিরে আসেন।

ওদিকে কুরাইশরাও দূত পাঠায়। দু’পক্ষে আলাপ-আলোচনা চলল। কুরাইশরা পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করলো। এরপর তারা খুব দ্রুত সোহাইল ইবনে আমরকে সন্ধি করার জন্য প্রেরণ

করল। সোহাইলকে তাকিদ দিয়ে দেয়া হলো যে, মুহাম্মদ যেন এ বছর ফিরে যায়। সোহাইল রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করল এবং পরিশেষে দু'পক্ষ সন্ধির শর্তাবলীর উপর একমত হলো। শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ:

১. মুহাম্মদ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবে। আগামী বছর মুসলিমরা মক্কায় আসবে এবং তিনদিন অবস্থান করবে।
২. উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এই সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিত ও নিরাপদে থাকবে এবং কেউ কারো উপর কোন প্রকার হামলা করবে না।
৩. যার ইচ্ছা মুহাম্মদের চুক্তি ও সন্ধিতে প্রবেশ করতে পারবে। আর যার ইচ্ছা কুরাইশদের চুক্তি ও সন্ধিতে প্রবেশ করতে পারবে।
৪. কুরাইশদের কোন লোক যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদের কাছে যায়, তাহলে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গীদের কেউ যদি কুরাইশদের কাছে চলে যায়, তবে তারা তাকে ফেরৎ দেবে না।

চুক্তির খসড়া প্রণীত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আলী (রা:)কে ডেকে সন্ধি লেখার জন্য নির্দেশ করলে তিনি লিখলেন। আর এভাবে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হলো।

সন্ধি শেষে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)- এর পরামর্শে প্রথমে তিনি ইহরামের কাপড় খুলে মাথা মুণ্ডণ এবং হাদী (কুরবানীর পশু) জবাই করেন। অত:পর সাহাবা কেরামও সকলে হাদী জবাই করেন এবং কিছু

সংখ্যক সাহাবী মাথার চুল মুণ্ডন করেন আর কেউ কেউ মাথার চুল ছোট করেন।

মুসলমানগণ বায়তুল্লাহ্ এর তওয়াফ না করতে পেরে ও বাহ্যিকভাবে সন্ধিতে নতি স্বীকার থাকায় দু:খ-দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়েন। বিশেষ করে উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) তো রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে এ নিয়ে বেশ পর্যালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এরপর আল্লাহ্ সূরা ফাতহের সে সব আয়াত নাজিল করেন যার শুরুতে রয়েছে:

الفتح: ١ Z & % $ # " ! [

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"
[সূরা ফাত্হ:১]

অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উমার (রা:)কে ডেকে আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনালেন। উমার (রা:) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! এটাই কি বিজয়!? তিনি বললেন: হ্যাঁ, ইহাই বিজয়। এ কথা শুনে উমার (রা:)-এর মন শান্ত হলো এবং তিনি ফিরে গেলেন। এরপর নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবীগণকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

• খায়বারের যুদ্ধঃ

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ৭ম হিজরীর মুহররম মাসে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খায়বার মদীনা থেকে উত্তরে আশি মাইল দূরে অবস্থিত। দুর্গ এবং খেত খামার বিশিষ্ট একটি বেশ বড় শহর। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সাথে শুধু ঐসকল লোকই যেতে

পারবে যাদের প্রকৃত জিহাদের প্রতি আগ্রহ আছে। এ ঘোষণার ফলে তাঁর সাথে শধুমাত্র ঐসকল লোকই যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যাঁরা হোদায়বিয়ার কুল গাছের নীচে বায়েতে অংশ নিয়েছিলের। এঁদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত (১৪০০) মাত্র।

এ সময়ে ইহুদিদের সাহায্যার্থে মোনাফেকরা যথেষ্ট ছুটাছুটি করে। মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই খায়বারে খবর পাঠিয়েছিল যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তোমাদের উদ্দেশ্যে ওদিকে যাচ্ছে সতর্ক হয়ে যাও, প্রস্তুত হও, ভয় পেয়ো না যেন। তোমাদের সংখ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্র তো অনেক। মুহাম্মদের সঙ্গীদের সংখ্যা বেশি নয় এবং তারা নি:স্ব। এ খবর পেয়ে ইহুদিরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও মিত্রদের থেকে সাহায্য কামনা করে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খায়বারের পার্শ্বে পৌঁছে সাহাবাগণকে থামতে বললেন এবং গ্রাম-বন্দরে প্রবেশের দোয়া পাঠ করলেন। অত:পর বললেন: আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। যুদ্ধ শুরুর সকালের আগে মুসলমানগণ খায়বারের উপকণ্ঠে রাত যাপন করেন। ইহুদিরা এ খবর জানতেও পারেনি বরং তারা খেতে খামারে কাজ করার জন্য সকালে বেরিয়ে পড়ে ছিল।

হঠাৎ মুসলিম সেনাদের দেখে চিৎকার করে তারা বলছিল: আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সৈন্যরা হাজির হয়েছে। অত:পর তারা তাদের শহরের দিকে পালাতে লাগলো। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: আল্লাহু আকবার, খায়বার বরবাদ হয়েছে, আল্লাহু আকবার, খায়বার বরবাদ হয়েছে। আমরা যখন কোন জাতির

ময়দানে নেমে পড়ি তখন সে জাতির ভীত লোকদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আলী ইবনে আবী তালিব (রা:)কে পতাকা দিলেন। যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও রসূলও তাকে ভালবাসেন। আলী (রা:) মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলে নবী [ﷺ] তাঁকে বলেন: দাঁড়াও! তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম! যদি তোমার দ্বারা একজন মানুষও হেদায়েত পায়, তাহলে ইহা লাল উটের চেয়েও উত্তম। আলী [رضي الله عنه] "নায়েম" দুর্গের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে চললেন। এ দুর্গের মালিক ছিল "মারহাব" নামে এক দুর্ধর্ষ ইহুদি। তাকে এক হাজার পুরুষের শক্তি সম্পন্ন বীর মনে করা হত।

আলী (রা:) তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। তারা এ দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং মোকাবেলার জন্য এসে দাঁড়ালো। দু'পক্ষের মধ্যে তুমল যুদ্ধ শুরু হলো। আলী (রা:) মারহাবের মাথা লক্ষ করে এমন আঘাত হানলেন যে, ইহুদি সেখানেই শেষ হয়ে গেল এবং তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হলো। মুসলমানগণ ইহুদিদের মোট আটটি দুর্গ সবগুলোই বিজয় করেন।

ইবনে আবুল হাকীক আলাপ-আলোচনার জন্য রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট পয়গাম পাঠায় যে, আমি কি আপনার কাছে এসে কথা বলতে পারি? রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। অনুমিতি পেয়ে ইবনে আবুল হাকীক এই শর্তে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে যে, দুর্গে যে সকল সৈন্য রয়েছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা তাদের কাছে থাকবে। তারা নিজেদের

অর্থ-সম্পদ সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, ঘোড়া, বর্ম ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর রসূলের কাছে অর্পণ করবে।

তারা শুধু পরিধানের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ প্রস্তাব শুনে বললেন: যদি তোমরা কিছু গোপন কর, তাহলে সে জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূল দায়ী হবেন না। ইহুদিরা এ শর্ত মেনে নেয় এবং সন্ধি হয়ে যায়। এ সন্ধির পর সকল দুর্গ মুসলমানদের নিকট সমর্পণ করা হয়। আর এভাবে খায়বারের জয় চূড়ান্তরূপ লাভ করে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ইহুদিদের খায়বার থেকে বহিস্কারের ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহুদিরা বলল: হে মুহাম্মদ! [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আপনি আমাদের এই জমিনেই থাকতে দিন আমরা এর তত্ত্বাবধান করবো। তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে এ শর্তে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে জমি বর্গা দেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যতোদিন চাইবেন ততোদিন তাদের এ সুযোগ দেবেন আর যখন ইচ্ছা তাদের বহিস্কার করবেন চুক্তি হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:) তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ও উৎপাদিত শস্যের অনুমানকারী নিযুক্ত ছিলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খায়বারের গণিমতের মোট জমিকে ৩৬ভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেক ঘোড় সওয়ারী সৈনিককে তিনভাগ ও পদব্রজের সৈনিককে একভাগ করে বণ্টন করে দেন।
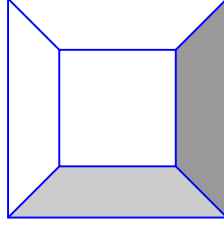
@ রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ
@ যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ইসলামের দা'ওয়াত
@ বিজয় আর না হয় শাহাদাত
@ সত্যের বিজয় ও বাতিলের পরাজয়
@ ক্ষমা ও মার্জনার চমৎকার দৃষ্টান্ত
@ বিজয় আল্লাহর হাতে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নয়
@ অন্তর বিজয়ের জন্য চাই মহান চরিত্র ও উত্তম আদর্শ
@ আল্লাহর রাস্তায় খরচের নজির
@ পবিত্র দু'টি আমানতঃ কুরআন ও সুন্নাহ

মু'তার যুদ্ধঃ

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ৮হিজরীর জামাদিউল আওয়াল মাস ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক আগষ্ট আথবা সেপ্টেম্বর মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মু'তা হচ্ছে শামের (সিরিয়ার) বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এর ও বায়তুল মাকদেসের মধ্যে মাত্র দু'মারহালার (৩২ মাইল) ব্যবধান।

এই যুদ্ধের কারণ ছিলঃ রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হারেস ইবনে উমাঈর আল-আজদী (রা:)কে একটি চিঠিসহ বসরার গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন। রোমের কায়সারের গভর্নর শারহাবীল ইবনে আমর আল-গাস্সানী সে সময় বালকা এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এই দুর্বৃত্ত রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দূতকে গ্রেফতার করে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নির্মমভাবে হত্যা করে। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর প্রেরিত দূতের হত্যার খবর শোনার পর খুবই মর্মাহত হন। তিনি তিন হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে সে এলাকায় পাঠান। ইতি পূর্বে খন্দকের যুদ্ধের সময় ছাড়া এত বড় ইসলামি বাহিনীর সমাবেশ ঘটেনি।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা:)কে এই সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করেন। এরপর বলেন যে, জায়েদ যদি নিহত হয়, তবে জাফর ইবনে আবি তালিব (রা:) এবং জাফর (রা:) যদি নিহত হয়, তবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা:] সিপাহসালার নিযুক্ত হবে।

নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসলিম সেনাদলের জন্য সাদা পতাকা তৈরী করেন এবং জায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা:)-এর কাছে সমর্পণ করেন। সৈন্যদলকে তিনি অসিয়ত করেন যে:

হারেস ইবনে উমাঈর (রা:)-এর হত্যাকাণ্ডের জায়গায় সর্বপ্রথম স্থানীয় লোকদের যেন ইসলামের দা‘ওয়াত দেয়। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে ভাল। আর যদি না করে তবে আল্লাহর নিকট বিজয়ের জন্য দোয়া করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন: তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে, আল্লাহ তা‘য়ালাকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত করবে না। কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং গির্জায় একাকী বসে আছে এমন কোন দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। খেজুর ও অন্য কোন ফলদার বৃক্ষ কাটবে না এবং কোন বাড়ী-ঘর ধ্বংস করবে না।

ইসলামি বাহিনী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে সাধারণ মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মনোনীত সেনানায়কদের সালাম ও বিদায় জানান। মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হলে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সানিয়াতুল ওয়াদা‘ পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে সৈন্যদের বিদায় জানান।

উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মুসলিম সৈন্যরা উত্তর হেজাজ সংলগ্ন শামের “মা‘আন” নামক এলাকায় পৌঁছে অবস্থান নেন। সে সময় মুসলিম বাহিনীর নিকট খবর পৌঁছলো যে, রোমের হিরাক্লিয়াস বালকা অঞ্চলের “মাআব” এলাকায় এক লক্ষ রোমক সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। তাদের সাথে লাখাম, জাযাম,

বালকীন, বাহরা এবং বালা গোত্রের আরো এক লক্ষ সৈন্য মিলিত হয়েছে।

ইসলামি বাহিনী এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুক্ষীন হলেন। তাঁরা কি তিন হাজার সৈন্যসহ দু'লক্ষ বিশাল দুর্ধর্ষ বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবেন? বিস্মিত চিন্তিত মুসলমানগণ দু'রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। অত:পর তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন যে, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে পত্র লিখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হোক।

এরপর তিনি [ﷺ] হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন এবং সেই নির্দেশ তখন পালন করা যাবে। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি এ বলে সকলকে উৎসাহিত করলেন যে, আমরা শুধুমাত্র শহীদ হওয়ার জন্যই বের হয়ে এসেছি। কাজেই আমাদের সামনে দু'টি কল্যাণের মধ্যে একটি অবশ্যই লাভ করবো। হয়তো জয়লাভ অথবা শাহাদাতবরণ। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:)-এর মতের পরিপ্রেক্ষিতে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মু'তায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং অত্যন্ত তীব্র লড়াই শুরু হয়। মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দু'লক্ষ সৈন্যের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধ ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ঈমানের বাহাদুরী চলতে থাকলে এ ধরণের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটা অতি সহজ ব্যাপার।

সর্বপ্রথম জায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা:) পতাকা ধারণ করেন। অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর পতাকা ধারণ করেন জাফার ইবনে আবী তালিব (রা:)। তিনিও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাতবরণ করেন। সে সময় তাঁর শরীরে তীর ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাত ছিল যার একটিও পেছনের দিকে ছিল না। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:) পতাকা শক্ত হাতে গ্রহণ করেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। পরিশেষে তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। এরপর পতাকা শক্ত হাতে ধারণ করেন সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা:) এবং তুমুল যুদ্ধ করেন। পরিশেষে আল্লাহ তাঁর হাতেই শুত্রুদের উপর বিজয়দান করেন। এদিকে যুদ্ধের ময়দানের খবর মানুষের নিকট পৌঁছার পূর্বেই রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদীনাতে এ যুদ্ধের খবর অহির দ্বারা প্রদান করেন। মুসলমানরা নিরাপদে একজোটে মদীনা পর্যন্ত ফিরে আসেন।

হতাহতের সংখ্যাঃ

মু'তার যুদ্ধে ১২জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। অন্যদিকে রোমকদের মধ্যে কতজন হতাহত হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ জানা জায়নি। তবে যুদ্ধের বিবরণে বোঝা যায় যে, তাদের বহু হতাহত হয়েছিল।

. মক্কা বিজয়ঃ

হিজরতের ৮ম বর্ষে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কার যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ১০ই রমজান দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। তিনি কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে ও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মসজিদে হারামের দিকে অগ্রসর

হন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেন ও কা'বা ঘর তওয়াফ করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি ধনুক ছিল। সে সময় বায়তুল্লাহ্-এর চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তিনি মূর্তিগুলোকে ধনুক দিয়ে আঘাত হেনে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করতেছিলেন:

[i j k l m o p q r s Z الإسراء: ৮১

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" [সূরা বনি ইসরাঈলা: ৮১]

আর মূর্তিগুলো মুখের উপর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেছিল। এরপর তিনি কা'বার ভিতরে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন।

অত:পর নবী [ﷺ] কা'বা ঘরের দরজার উপর দণ্ডায়মান হন। আর কুরাইশরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল মসজিদে হারামে। তারা সকলে প্রতিক্ষায় আছে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের সঙ্গে কি ধরণের আচরণ করেন তা জানার জন্য।

এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:হে কুরাইশরা! আমার নিকট থেকে তোমরা কি ধরণের ব্যবহারের আশা করো? সবাই বলল: আমরা উত্তম ও ভাল ব্যবহারের আশা করি। আপনি একজন মহৎ মানুষ এবং মহৎ ব্যক্তির সন্তান। তিনি [ﷺ] বললেন: আমি তোমাদের আজ ঐ কথাই বলব, যা ইউসুফ (আ:) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন:

[لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴿٩٢﴾ Z يوسف: ٩٢

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।"
[সূরা ইউসুফ: ৯২]

যাও তোমরা আজ সবাই মুক্ত। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেদিন ক্ষমার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। ক্ষমা করেন যারা তাঁকে ও তাঁর সাহাবাদেরকে কঠিন নির্যাতন করেছিল, হত্যা করেছিল, সার্বিক কষ্ট দিয়েছিল, দেশান্তর করেছিল। আর মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে।

- **হোনায়েনের যুদ্ধঃ**

শত্রুপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সকলে সমেবত হয়ে রওয়ানা হলো। তারা তাদের পরিবার-পরিজন সঙ্গে নিয়ে চলল। এভাবে সফর অব্যহত রাখল এবং "যুল মাজাযের" সন্নিকটে হোনায়েন উপত্যকায় অবতরণ করল। সেখান থেকে আরাফাতের ময়দান হয়ে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলের একটু বেশি।

এদিকে শত্রু পক্ষের নানারকম খবর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পাচ্ছিলেন। তিনি আবু হাদরাদ আল-আসলামীকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, তুমি শত্রুদের মাঝে গিয়ে অবস্থান করো এবং তাদের খবরা খবর এনে দাও। তিনি তাই করলেন।

৮হিজরীর ৬ শাওয়াল রোজ শনিবার রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কা থেকে ১২হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিছু লোক সৈন্য সংখ্যার আধিক্য দেখে বললেনঃ আমরা আজ কিছুতেই পরাজিত হব না।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ কথাটি মোটেই পছন্দ করলেন না।

১০শাওয়াল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মুসলিম বাহিনী হোনায়েনে পৌঁছল। মালেক ইবনে আওফ আগেই এ জায়গায় পৌঁছে রাতের অন্ধকারে তার গুপ্তচরদের রাস্তায়, প্রবেশদ্বারে, গিরিপথে, সঙ্কীর্ণপথে ও গোপনস্থানে সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল। আর তাদের এ নির্দেশ দিয়েছিল যে, মুসলমানরা আসা মাত্রই তাদের উপর তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করবে এবং কিছুক্ষণ পর একজোটে হামলা করবে।

এদিকে খুব প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সৈন্যদের মাঝে পতাকা ও ব্যানার বণ্টন করে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করলেন। খুব ভোরে মুসলিম সৈন্যরা হোনায়েনের প্রান্তরে পদার্পণ করলেন। শত্রুসৈন্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না। শত্রুরা যে, গিরিপথে ওঁৎ পেতে রয়েছে এ সম্পর্কে অনবহিত মুসলিম সৈন্যরা নিশ্চিন্তে অবস্থান নেয়ার সময় হঠাৎ করে তাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরই শত্রুরা একযোগে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলেন। আর এটাই ছিল সুস্পষ্ট পরাজয়।

সাহাবাগণ ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ডান দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন: হে লোক সকল! তোমরা আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রসূল ও আমি আব্দুল্লাহ্ এর ছেলে মুহাম্মদ। সেই সময় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে অল্প কিছু মুহাজির ও আনসার সাহাবী ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেই নাজুক অবস্থায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নজির বিহীন বীরত্বের ও

সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। তাঁর খচ্চর কাফেরদের দিকে জোর গতীতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি বলতেছিলেনঃ আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)কে সাহাবাগণকে উচ্চস্বরে ডাকতে নির্দেশ করলেন। আব্বাস (রাঃ) উঁচু শব্দের লোক ছিলেন। তিনি সাহাবাগণকে উঁচু শব্দে ডাকার সাথে সাথে তাঁরা যেভাবে দ্রুত রণাঙ্গন থেকে চলে গিয়েছিল তেমনি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ইতিমধ্যে রণক্ষেত্র তুমুল যুদ্ধ ও গরম হয়ে উঠেছে। তিনি বললেনঃ “এবার যুদ্ধক্ষেত্র গরম হয়ে উঠেছে”।

এরপর তিনি একমুঠো ধুলো তুলে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে বললেনঃ “শা-হাতিল উজূহ্” অর্থঃ চেহারা বিগড়ে যাক। নিক্ষিপ্ত ধুলোর ফলে প্রত্যেক শত্রুর চোখে ধূলি ধূসরিত হলো। তাদের বাহাদুরী খর্ব হলো এবং প্রাণ নিয়ে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করলো।

ধুলো নিক্ষেপের কিছুক্ষণ পরই শত্রুরা চরমভাবে পরাজিত হলো। শুধুমাত্র সকীব গোত্রের ৭০জন কাফের নিহত হলো। তাদের সাথে নিয়ে আসা ধন-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র, নারী, শিশু ও পশুপাল সবকিছু মুসলমানদের হস্তগত হলো।

এ যুদ্ধের গণিমত ছিলঃ ৬হাজার যুদ্ধবন্দী, উট ২৪হাজার, ছাগল ৪০হাজারের বেশি। চাঁদি ৪হাজার উকিয়া যা ১লক্ষ ৬০ হাজার দিরহাম। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সমুদয় মালামাল জমা করার নির্দেশ দিলেন। “জে‘রানাহ” নামক

স্থানে সমস্ত সম্পদ একত্রিত করে মাসউদ ইবনে আমর আল-গিফারী (রা:)-এর নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। তায়েফ যুদ্ধ হতে অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি এসব সম্পদ বণ্টন করেননি।

. তায়েফের যুদ্ধঃ

এ যুদ্ধ আসলে হোনায়েনের যুদ্ধেরই অংশ। হাওয়াজেন ও সকীফ গোত্রের পরাজিত লোকদের অধিকাংশই তাদের সেনাপ্রধান মালেক ইবনে আওফ আন-নাসরীর সাথে তায়েফে চলে গিয়েছিল এবং সেখানে আত্মগোপন করেছিল। এ কারণে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন।

প্রথমে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা:)-এর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য তায়েফে পাঠানো হয়। এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজে তায়েফের পথে রওয়ানা হন। সফর অব্যহত রেখে তায়েফে পৌঁছার পর মালেক ইবনে আওফের দুর্গের পার্শ্বে আবতরণ করেন। আর সেখানেই সৈন্য মোতায়েন করেন ও দুর্গবাসীর উপর অবরোধ করেন।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ সময় উভয়ের মধ্যে তীর ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। অবরোধের প্রথম দিকে দুর্গবাসীরা মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ডভাবে একাধারে তীর নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকজন মুসলিম সৈন্য আহত এবং ১২জন শহীদ হন। এর ফলে মুসলমানগণ তাঁবু সরিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে বর্তমান তায়েফের মীকাতের মসজিদের পার্শ্বে ডেরা পাতেন। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লো এবং দুর্গ বিজয় করাও কঠিন হয়ে গেল। মুসলমানগণ অনেকেই আহত হলেন। ওদিকে শত্রুরা এক বছরের খাদ্য দুর্গের ভেতরে মজুদ করে রেখেছিল।

এ সময় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নাওফাল ইবনে মু‘আবিয়া আদ-দাইলী (রা:)-এর সাথে পরামর্শ করেন। নাওফাল (রা:) বলেনঃ শৃগাল তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। যদি অবরোধ দীর্ঘায়িত করেন তবে তাদের পাকড়াও করতে পারবেন। আর যদি ফিরে যান তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সফরের জন্য নির্দেশ করলেন।

অবরোধ তুলে নিয়ে তায়েফ থেকে ফিরে এসে “জে‘রানাহ” নামক স্থানে দশ দিনের বেশি সকলে অবস্থান করেন। অত:পর বিভিন্ন গোত্র প্রধান, মক্কার নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্যদের মাঝে গণিমতের মাল বণ্টন করেন। এরপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

. তাবুকের যুদ্ধঃ

আভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রায় শেষ। মুসলমানরা আল্লাহর শরীয়তের সার্বজনীন শিক্ষা ও ইসলামি দা‘ওয়াতের প্রচার-প্রসারের জন্য ঐকান্তিকভাবে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। কিন্তু একটি শক্তি যারা কোন প্রকার উস্কানি ছাড়াই মুসলমানদের গায়ে পড়ে বিবাদ বাধাতে চাচ্ছিল। এরা হলো রোমক শক্তি, যারা ছিল সমকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। মুসলমানদের পক্ষে মু‘তার যুদ্ধের পরে যে, সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার হয়েছিল তা হতে রোমের কায়সারের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এ কারণে সে রোমের অধিবাসী ও রোমের অধীনস্থ গাস্‌সান পরিবার ও অন্যান্য আরবদের থেকে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে এবং এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে।

এদিকে মদীনায় রোমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির খবরা-খবর পর্যায়ক্রমে আসতেছিল। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন জানতে পারলেন যে, হেরাক্লিয়াস ৪০হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তৈরী করেছে এবং রোমের এক বিখ্যাত যোদ্ধা সেই বাহিনীর নেতৃত্ব করছে। আর অগ্রবর্তী বাহিনী "বালকা" নামক স্থানে পৌঁছে গেছে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সকল পরিস্থিতি এবং অবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে সাহাবাগণের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসী ও আরবের বিভিন্ন গোত্রকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাগণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং আল্লাহর পথে উত্তম সম্পদ ব্যয় ও দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নির্দেশ পালনে সাহাবা কেরাম প্রতিযোগিতা শুরু করলেন। তাঁদের শিংহভাগে ছিলেন উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:)। তাঁর সদকার পরিমাণ ছিল ৯০০ উট ও ১০০ঘোড়া এবং ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ও ২০০ রৌপ্য মুদ্রা।

এ দিনে উমার ফারুক [رضي الله عنه] অর্ধেক মাল দান করে আবু বকর [رضي الله عنه]-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে লজ্জা পান। আর আবু বক্র (রা:) তো বাড়ীতে আল্লাহ ও রসূলকে রেখে সবকিছুই ফী সাবীলিল্লাহ দান করেন।

সাহাবাগণ অতি দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মদীনার চারিদিক থেকে জিহাদে আগ্রহী মুসলমানগণ আসতে থাকেন। আর এ সময়টা ছিল গ্রিস্মের প্রচণ্ড উত্তপ্ত মৌসুম ও রাস্তা ছিল

অনেক দূরের এবং সরঞ্জামও ছিল অপ্রতুল্ল। আর এ জন্যেই এ যুদ্ধকে "সা'আতুল 'উসরাহ ও জাইশুল 'উসরাহ" তথা সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [সূরা তাওবা:১১৭ আয়াত দ্রষ্টব্য]

এভাবে মুসলিম সৈন্যরা প্রস্তুতি নিলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ৯ হিজরীর রজব মাসে রোজ বৃহস্পতিবার ৩০হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মদীনা হতে উত্তর দিকে রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে এতো বড় সেনাদল কখনো তৈরী হয়নি। তিনি তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন এবং এক পর্যায়ে তাবুকে পৌঁছে সেখানে তাঁবু স্থাপন করলেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রোমক সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য সাহাবা কেরামকে অনুপ্রাণিত করলেন। আর সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন। এই ভাষণে সৈন্যদের মনোবল বেড়ে গেল। তাঁদের পাথেয়, অর্থ-কড়ি ও রসদ সামগ্রীর যে ক্রুটি ও কমতি ছিল তা পূরণ হয়ে গেল।

অন্যদিকে রোম এবং তাদের মিত্ররা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আগমনের খবর পেয়ে ভীত হয়ে পড়ল। তারা সামনে এগিয়ে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারল না। তারা নিজেদের শহরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ইহা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর প্রমানিত হলো। আরব এবং আরবের বাইরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমানদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা-পর্যালোচনা হতে লাগল। ইসলামি সৈন্যদল তাবুক হতে সফল ও

বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন। এ যুদ্ধে কোন প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট।
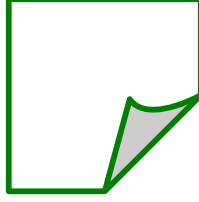
নবী [ﷺ]-এর যুদ্ধসমূহের পর্যালোচনা

যদি আমরা নবী [ﷺ]-এর সমস্ত যুদ্ধ ও সেনা অভিযানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও পর্যালচনা করি, তাহলে যারা যুদ্ধের পটভূমি, পরিবেশ, পরিচালনা, নিকট ও দূরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফলের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করবেন তারা মুহাম্মদ [ﷺ]কে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-বিশারদ ও সমর নায়ক বলে স্বীকার করবেন। তিনি [ﷺ] যেমন নবী-রসূলগণের মধ্যে নবুয়াত ও রিসালাতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তেমনি ছিলেন সর্বশ্রেয় সমর যুদ্ধে।

যুদ্ধের স্থান নির্বাচন, সেনাবাহিনীর বিন্যাস, সমর কৌশল, অস্ত্রের ব্যবহার বিধি, আক্রমণ, পশ্চাদগমন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে তিনি সাহসিকতা, সতর্কতা ও দূরদর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। নবী [ﷺ]-এর সমর পরিকল্পনা ও যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে কোন দিন কোথাও কোন ত্রুটি কিংবা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। আর এ কারণেই মুসলিম বাহিনী কখনও কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেননি।

অবশ্য ওহুদ ও হুনাইন যুদ্ধে সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুক্ষীন হতে হয়ে ছিল। কিন্তু সমর পরিকল্পনা কিংবা যুদ্ধ কৌশলের ত্রুটি অথবা ঘাটতির কারণে হয়নি। বরং সেনাবাহিনীর কিছু লোকের পক্ষ থেকে নবী [ﷺ]-এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য হয়েছিল। এ দু'টি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের মূখে নবী [ﷺ] অতুলনীয় সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মানব জাতির যুদ্ধ ইতিহাসে একমাত্র তিনিই ছিলেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের বিভীষিকার মুখেও পর্বতের ন্যায় অটল থাকার

কারণে প্রায় বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনী ছিনিয়ে এনেছিল মহা বিজয়ের গৌরব।

এ ছিল যুদ্ধ পরিচালনার দিক। এছাড়াও অন্য দিকে এসব সকল যুদ্ধ দ্বারা তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। আর ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও অনিষ্টতার আগুন নির্পাপিত করেন। মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করে একটি পরিচ্ছন্ন ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন। আর সন্ধিচুক্তির দ্বারা শত্রুদের বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে দা'ওয়াতের ময়দানকে উন্মুক্ত করেন। অন্য দিকে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফেকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে মুসলিমদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

অন্য দিকে বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে মুখোমখী মুকাবিলায় লিপ্ত হয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টির মাধ্যমে এক যুদ্ধাভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী তৈরী করেন। পরবর্তী কালে এই বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে বিশাল বিশাল পারস্য ও রোমক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। আর শত্রুদেরকে তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ, বাগান, ঝর্না ও ক্ষেতখামার থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুরূপভাবে নবী [ﷺ] সকল যুদ্ধের দ্বারা হিজরতের কারণে ছিন্নমূল মুসলিমদের আবাসভূমি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক কার্যাদির মাধ্যমে আয় উপার্জনহীন শরণার্থীদের জন্য উত্তম পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করেন।

এ ছাড়া তিনি যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের যুগোপযোগী সরঞ্জামাদি এবং যুদ্ধের ব্যয়ের অর্থ ইত্যাদিও সংগ্রহ করেন। আর এসব করতে গিয়ে কখনও তিনি বিধি বহির্ভূত কোন ব্যবস্থা অন্যায় কিংবা উৎপীড়নের পথ অবলম্বন করেননি।

যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নীতির ক্ষেত্রে নবী [ﷺ] এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। জাহেলিয়াতের যুগে যুদ্ধের রূপ ছিল লুঠতারাজ, নির্বিচারে হত্যা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ ও নির্যাতন ও কঠোরতা অবলম্বন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম জাহিলি যুগের সেই যুদ্ধ নামের দানবীয় কাণ্ডকারখানাকে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে পবিত্র জিহাদে রূপান্তরিত করে।

জিহাদ হচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা। এতে কোন প্রকার অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি, অবিচার, উৎপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অপহরণ, অহেতুক হত্যা ইত্যাদি কোন কিছুর সামান্যতম অবকাশ ছিল না। ইসলামে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসরণ করা হত।

শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ, মল্ল যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্দী ও যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিভিন্ন ব্যাপারে নবী [ﷺ] যে নিয়ম নীতি অনুসরণ করেছেন সর্বযুগের সমর বিশারদগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভূমি কিংবা সম্পদ দখল, সাম্রাজ্য বিস্তার অথবা আধিপত্যের সম্প্রসারণ করা নয়। বরং নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে সত্যের পথে আনা, ন্যায় ও কল্যাণের ভিত্তিতে সমাজের সদস্য হিসাবে সম্মানজনক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা। আর সকল প্রকার ভূয়া আভিজাত্যের বিলোপ সাধন করে অভিন্ন এক মানবত্ববোধের উন্মেষ ঘটান এবং প্রতিপালন ও পরিশোধন করা।

এ ছাড়া মানুষের বহুত্ববাদী ধারণার ফলে সমাজ জীবনে যে অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তদস্থলে মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো এবং নিরাপদ, শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী [ﷺ]-এর যুদ্ধের প্রধান কারণ।

নবী [ﷺ] যুদ্ধের যে সকল মানবোচিত আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান কিংবা সাধারণ সৈনিকগণ যাতে কোনক্রমেই তার অপপ্রয়োগ না করেন অথবা এড়িয়ে না যান তার প্রতি তিনি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

সোলাইমান ইবনে বুরাইদা তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন। নবী [ﷺ] যখন কোন ব্যক্তিকে মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা অভিযাত্রী দলের নেতা নির্বাচিত করতেন তখন গন্তব্যস্থলে যাত্রার প্রাক্কালে তাকে আল্লাহর তাকওয়া (ভয়-ভীতি) অবলম্বন করতে এবং সঙ্গী সাথীদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করতেন। এরপর বলতেন:"আল্লাহর নির্দেশিত পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে। যারা আল্লাহর কুফরি করেছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের কোন ব্যক্তির নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করবে না। কোন নারী, শিশু বাচ্চাকে হত্যা করবে না---।

অনুরূপভাবে তিনি সহজভাবে কাজ করতে নির্দেশ করতেন। তিনি বলতেন:"তোমরা (সব ব্যাপারে) সহজ করবে কঠিন করবে না এবং সুসংবাদদান করবে ঘৃণা সৃষ্টি করে ভাগিয়ে দেবে না।" [মুসলিম]

আর যখন তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তির নিকট রাত্রে পৌঁছতেন তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। কোন শত্রুকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কোন ব্যক্তিকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করতে এবং মহিলাদের মারধর ও হত্যা করতে নিষেধ করতেন। তিনি লুটতারাজ থেকে নিষেধ করে বলেনঃ লুণ্ঠন-লব্ধ সম্পদ মুর্দার চাইতে অধিক পবিত্র নয়।

এ ছাড়া ক্ষেতখামার নষ্ট করা, পশু হত্যা এবং অহেতুক গাছপালা কেটে ফেলতে তিনি নিষেধ করতে। অবশ্য যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে গাছপালা কেটে ফেলার অনুমতি দিতেন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও না।

নবী [ﷺ] মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালেও নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, আহত ব্যক্তিদের আক্রমণ করেব না, কোন পালাতকের পিছনে ধাওয়া করবে না এবং কোন বন্দীকে হত্যা করবে না, কোন রাষ্ট্রের দূতকে হত্যা করবে না। অঙ্গীকারবদ্ধ অমুসলিম দেশের নাগরিকদের হত্যা করতে তিনি [ﷺ] কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“কোন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরেরও বেশি দূর থেকে পাওয়া যাবে।”

উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়া তিনি [ﷺ] অনেক উন্নত মানের নিয়ম ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে তাঁর সমর কার্যক্রম জাহেলিয়াতের যুগের পৈশাচিকতা ও অপবিত্রতার কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জিহাদের রূপ লাভ করে। [আররাহীকুল মাখতূম, মুবারোকপুরীঃ পৃ:৪৯৬-৪৯৮ দ্র:]

- নবী (ﷺ)-এর অধিক বিবাহের হিকমত
- নবী (ﷺ)-এর পরিবার পরিচিতি
- উত্তম আদর্শ ও অনুপম দৃষ্টান্ত
- কিছু মু'জেযা যা নবুয়াতের দলিল
- নবী (ﷺ)-এর সুমহান চরিত্র
- মুহাম্মদ [ﷺ] বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে

আহলে বাইতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন: নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণ, সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর বংশের তথা বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিবের সমস্ত মুমিন নারী-পুরুষ। আহলে বাইতের সকল সদস্যের উপর জাকাতের মাল ভক্ষণ করা হারাম। যেমন: আলী ইবনে আবি তালিব, জাফর ইবনে আবি তালিব, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব [رضي الله عنهم] ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ।

Ø একাধিক বিবাহের হিকমত:

নবী করীম [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর উম্মতের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। যে সকল মহিলার সাথে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁদের সংখা ছিল **১১**জন। তাঁরা সকলে পরকালেও নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী হবেন। তাঁরা সকলে উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা সমস্ত মুমিনদের মা। মুমিনদের নিজেদের মাদেরকে যেমন বিবাহ করা হারাম তেমনি তাঁদেরকেও বিবাহ করা হারাম।
[সূরা আহজাব: ৬ ও ৫৩]

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মৃত্যুর সময় তাঁদের ৯জন জীবিত ছিলেন। খাদীজা (রা:) ও উম্মুল মাসাকিন জায়নাব বিন্তে খোজাইমা (রা:) তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া অন্য দু'জন মহিলার সাথেও তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘর-সংসার হয়নি। স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রা:) ছাড়া সবাই ছিলেন বিবাহিতা তথা তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা। ৬ জন ছিলেন কুরাইশের এবং একজন ইহুদিদের। আর বাকিরা ছিলেন বিভিন্ন আবর গোত্রের।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চারটির বেশি বিবাহ করার অনুমতি দান করেন। কারণসমূহের মধ্যে:

১. নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর গোপনীয় অবস্থাদির পরিদর্শনকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। এর দ্বারা মুশরেকদের বিভিন্ন অপবাদ যেমন: মুহাম্মদ জাদুকর ইত্যাদির খণ্ডন করা।
২. আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সূত্র দ্বারা তাদের গৌরব অর্জন করা।
৩. বিভিন্ন গোত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করা।
৪. দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধির পরেও তাঁর মূল দায়িত্ব দা'ওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিমূখ না হওয়ার প্রমাণ।
৫. তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। যাতে করে নবীর সঙ্গে যুদ্ধকারীদের বিপক্ষে সাহায্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
৬. যে সকল বিধিবিধানের প্রতি পুরুষরা অবহিত হতে পারে না সেগুলোর প্রচার ও প্রসার। কারণ, যেসব বিষয়াদি স্ত্রীদের সঙ্গে ঘটে তার বেশিরভাগই গোপনীয় হয়ে থাকে।
৭. তাঁর গোপনীয় সুন্দর চরিত্রের প্রতি অবগত হওয়া। তিনি উম্মে হাবীবা (রা:)কে বিবাহ করেন অথচ তাঁর বাবা আবু সুফিয়ান নবী [ﷺ]-এর চরম বিরোধী ছিল। অনুরূপ তিনি সফিয়্যাহ [সুফিয়া] (রা:)কে বিবাহ করেন। আর ইহা ছিল তার বাবা, চাচা ও স্বামীর হত্যার পরের ঘটনা। যদি তিনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী না হতেন, তাহলে তাঁর নিকট থেকে এঁরা ভেগে যেতেন। কিন্তু বাস্তবতা এ ছিল যে, নবী [সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের নিজ পরিবারের সবার চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন।

৮. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে একশত জন পুরুষের যৌনক্ষমতা দান করেছিলেন। তাই পানাহারের স্বল্পতা ও বেশি বেশি রোজা রাখা সত্ত্বেও তাঁর অধিক সহবাসের শক্তি পরীক্ষিত। ইহা ছিল সাধারণ স্বভাবের পরিপন্থী এক মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়ের বহি:প্রকাশ।

৯. স্ত্রীদের হেফাজতকরণ; যাতে করে তাদের দৃষ্টি তিনি ছাড়া আর কারো প্রতি না পড়ে।

১০. অর্ধাঙ্গিণীদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং তাদের ভালবাসা অর্জন ও হেদায়াত দান করা।

এ ছাড়া দ্বীনি কারণের মধ্যে যেমন: জায়নাব বিন্তে জাহাশ (রা:)-এর বিবাহ দ্বারা জাহেলিয়াতের যুগে পালক পুত্রকে নিজ সন্তানের মত ধারণা করার বিলুপ্তি ঘোষণা। [সূরা আহজাব:৩৭]

আর রাজনৈতিক কারণের মধ্যে ছিল: কুরাইশদের বড় বড় এবং আরবদের শক্তিশালী গোত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককরণ।

এ ছাড়া সমাজিক কারণের মধ্যে ছিল: ঐ সমস্ত নারীদের সঙ্গে বিবাহ যাদের স্বামীরা ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ হয়ে ছিলেন তাঁদের বয়স্কা স্ত্রীদের বিবাহ করা। কারণ, এর দ্বারা তিনি তাঁদের ও স্ত্রীদের প্রতি দয়া ও ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

+ Cl.cahan বলেন: বর্তমান যুগের বিবেচনায় তাঁর (মুহাম্মদ) জীবনের কিছু দিক আমাদের মাঝে জটিলতা সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যৌন চাহিদা ছিল প্রবল। তারপরেও তিনি খাদীজা (রা:)-

এর মৃত্যুর পরে যে ৯ জনকে বিবাহ করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা। আর বিবাহের কারণ ছিল রাজনৈতিক। তিনি এসব বিবাহ দ্বারা উঁচু পরিবারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেন।

+ ইটালী লেখিকা L. Veccin Vaglieri: ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিরক্ষায় বলেন: মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এমন এক আরব সমাজে বসবাস করেন যেখানে সামাজিক বিবাহের কোন সংঘই ছিল না। আর সে সমাজের নীতিমালা ছিল একাধিক বিবাহ ও তালাক ছিল খুবই সহজ ব্যাপার ও সীমাহিন। এরপরেও তিনি তাঁর সমস্ত যৌবনকাল যে সময় যৌন চাহিদা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী থাকে খাদীজা (রা:) ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করেননি। যিনি ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খাদীজার সঙ্গে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির সাথেই এ পরম সুখ-শান্তির জীবন যাপন করেন এবং এর মধ্যে আর দ্বিতীয় কোন বিবাহ-শাদি করেননি। এরপরে যেসব বিবাহ করেন তার কারণ ছিল রাজনৈতিক অথবা সামাজিক।

+ :homas Carlye ইংরেজ লেখক: তাঁর "বীর পুরুষ" পুস্তকে বলেন: মুহাম্মদ যৌনচারের ভাই ছিলেন না যদিও তাঁকে জুলুম ও শত্রুতা করে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় জুলুম ও ভুল হবে যখন আমরা তাঁকে একজন যৌনাচার ব্যক্তি এবং তার উদ্দেশ্যই রঙতামাশা করা হিসাবে বিবেচনা করব। কক্ষনো না! ররং তামাশা ও তাঁর মাঝের দূরত্ব ছিল অনেক দূরের।

(ক) নবী সহধর্মিণীদের পরিচিতি:

(১) খাদীজাহ্ বিন্তে খোওয়াইলিদ (রা:):

হিজরতের পূর্বে মক্কায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরিবার ছিল নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা:)-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই বিবাহের সময় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ (পঁচিশ) বছর এবং খাদীজা (রা:)-এর বয়স ছিল ৪০ (চল্লিশ) বছর। খাদীজা (রা:) ছিলেন নবী করীম [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রথমা সহধর্মিণী। তাঁর জীবদ্দশায় রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আর অন্য কোন বিবাহ করেননি। নবীজির সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তার পর্যায়ক্রমে হালাহ ইবনে হাররাহ তামিমী ও আতীক ইবনে আবেদ মাখজুমীর সাথে বিবাহ হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন এবং নবী [ﷺ]কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। তিনি এ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পান।

তাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: খাদীজা এ যুগের নারীদের সরদারণী। তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং সকল স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য দিতেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ইবরাহিম ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন খাদীজার গর্ভজাত।

পুত্রদের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। তবে কন্যারা জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে জায়নাব, রোকাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহুন্না)। জায়নাবের বিবাহ হিজরতের পূর্বে তাঁর ফুফাত ভাই আবুল আস ইবনে রবী'র সাথে হয়েছিল। রোকাইয়া ও কুলছূমের বিবাহ পর্যায়ক্রমে উসমান (রা:)-এর সাথে

সম্পন্ন হয়। ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বিবাহ বদর এবং ওহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি নবী [ﷺ]-এর ক্রোড়ে লালিত-পালিত চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। তাঁদের সন্তান ছিলেন হাসান, হুসাইন, জায়নাব এবং উম্মে কুলছুম (রা:)। তিনি নবুয়াতের দশম সালে রমজান মাসে ৬৫ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং হাজূন নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে নবী [ﷺ] প্রচণ্ড দু:খ পান।

(২) সাওদা বিন্তে জাম'আ (রা:):

খাদীজা (রা:)-এর মৃত্যুর প্রায় এক মাস পর নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নবুয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর আগে সাওদা (রা:)-এর বিবাহ তাঁর চাচাতো ভাই সাকরান ইবনে আমরের সাথে হয়েছিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে আবিসিয়ায় হিজরত করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি বিধবা হন। উমার ফরুক [رضي الله عنه]-এর খেলাফতের শেষের দিকে ৫৪হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাত্র ৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৩) আয়েশা বিন্তে আবু বক্‌র (রাযিআল্লাহু আনহুমা):

নবুয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বিবাহ হয়। অর্থাৎ সাওদা (রা:)-এর সাথে বিবাহর এক বছর পর এবং হিজরতের দু'বছর পাঁচ মাস আগে। সে সময় আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহার) বয়স ছিল মাত্র ছয়-সাত বছর। দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বাসর ঘর সম্পন্ন

হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর এবং স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন কুমারী।

আয়েশা (রা:) ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মেয়েকে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিবাহ করেননি। আয়েশা (রা:) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী। উম্মতে মুহাম্মদীর মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞান সম্পন্ন ফকীহা তথা দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারিণী। সমস্ত মহিলার উপর তাঁর মর্যাদা ঐরূপ, যেমন ঐ সময়ের সকল খাদ্যের উপর সারীদ (এক প্রকার উন্নত মানের খাদ্য)-এর মর্যাদা ছিল। তিনি ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

একমাত্র তাঁরই লেপের ভিতরে নবী [ﷺ] শয়নকালে অহি নাজিল হয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয়েছে সূরা নূরে। তাঁর পালার দিনে হিসাব করে লোকজন নবী [ﷺ]-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। তাঁরই ক্রোড়ে নবী [ﷺ] মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁরই হুজরার ভিতরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তিনি ৫৭ অথবা ৫৮ হিজরী বর্ষের ১৭ই রমজান ৬১ বছর কয়েক মাস বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মদিনার কবরস্থান বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

(৪) হাফসা বিন্তে উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহুমা):

তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন খুনাইস ইবনে হুযাফাহ আসহামী। বদর ও ওহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইদ্দত শেষে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তৃতীয় হিজরী সালের শা'বান মাসে তাঁকে বিবাহ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২০বছর। জিবরীল [عليه السلام] তাঁর সম্পর্কে নবী [ﷺ]কে বলেন: হাফসা একজন রোজা পালনকারিণী ও রাত্রি কিয়ামকারিণী

নারী এবং জান্নাতে আপনার স্ত্রী। হিজরী ৪৫ সালের শা'বান মাসে মদীনায় তিনি মৃত্যবরণ করেন। সে সময় তাঁর বসয় হয়ে ছিল ৬০ বছর। মদিনার গভর্নার মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করেন। মদিনার কবরস্থান বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৫) জায়নাব বিন্তে খুযাইমাহ্ (রাঃ):

তিনি ছিলেন বনি হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'সা' বংশের। গরিব মিসকিনদের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমত্ববোধ এবং ভালবাসার কারণে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন তথা মিসকিনদের মা উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর স্ত্রী। ওহুদের যুদ্ধে উক্ত সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] চতুর্থ হিজরীতে তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন মাইমূনাহ (রাঃ)-এর বৈমাত্রিয় বোন ছিলেন। বিবাহের প্রায় দুই তিন মাস পর চতুর্থ হিজরীতে রবীউস্ সানী মাসে তিনি মারা যান। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজেই তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং মদীনার কবরস্থান বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(৬) উম্মে সালামা হিন্দ বিন্তে আবু উমাইয়্যা মাখজুমিয়্যাহ (রাঃ):

তিনি আবু সালামা (রাঃ)- এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভজাত আবু সালামার সন্তানাদি ছিলঃ উমার, সালামা ও জায়নাব। তাঁরা সকলেই সাহাবী ছিলেন। তিনি স্বামী আবু সালামা আব্দুল আসাদ মাখজুমী [ﷺ]-এর সাথে আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করেন। চতুর্থ হিজরীর জামাদিউস সানি মাসে স্বামীর মৃত্যুতে তিনি বিধবা হন। তিনি একজন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মাখজুমী বংশের মহিলা

ছিলেন। একই হিজরী সালের শাওয়াল মাসে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বিবাহ করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বিবেকবান ও ফাকীহা ছিলেন। ৯০ বছর বয়সে ৬২ হিজরী সনে মাদীনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়। নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেন।

(৭) জায়নাব বিন্তে জাহাশ ইবনে রিয়াব (রাঃ):

তিনি ছিলেন বনি আসাদ ইবনে খুযাইমা গোত্রের মহিলা এবং নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ফুফাতো বোন। তাঁর বিবাহ প্রথমে জায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ)-এর সাথে হয়েছিল। জায়েদকে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ছেলে মনে করা হত। কিন্তু জায়েদের সাথে জায়নাবের সংসার সুখী হয়নি, ফলে জায়েদ তাঁকে তালাক দেন। জায়নাবের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াত নাজিল করেন। "অত:পর জায়েদ যখন জায়নাবের সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম।" [সূরা আহযাব:৭]

এ সম্পর্কে সূরা আহজাবের আরো কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। এসব আয়াতে পালক পুত্র সম্পর্কিত বিতর্কের সুষ্ঠ ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে। জায়নাবের সাথে পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫বছর।

তিনি সবচেয়ে বেশি এবাদতগুজার এবং দানশীলা ছিলেন। ৫৩ বছর বয়সে ২০ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মৃত্যুর পর উম্মাহাতুল

মু'মিনীন তথা মুমিনদের জননীদের মধ্য হতে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযার সালাত উমার ফারুক (রা:) আদায় করেন এবং মদীনার কবরস্থান বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি মোট **১১**টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৮) জুওয়াইরিয়া বিন্তে আল-হারেস (রা:):

তাঁর পিতা ছিলেন খুযা'য়াহ গোত্রের শাখা বনি মুস্তালিকের সরদার। বনি মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দীদের সাথে জুওয়াইরিয়াকেও হাজির করা হয়। তিনি গণিমতের মাল বণ্টনে সাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস (রা:)-এর ভাগে পড়েছিলেন। সাবেত (রা:) শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেয়ার কথা জানান। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাাম] শর্তের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং পরে হিজরী পঞ্চম সনের শা'বান মাসে তাঁকে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। এর পূর্বে চাচাত ভাই মুসাফে' ইবনে সাফওয়ানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। আর তাঁর বাবা নবী [ﷺ] এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল বাররাহ। নবী [ﷺ] তাঁর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন জুওয়াইরিয়া।

এরপর বনি মুস্তালিক রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাাম]-এর শ্বশুর বংশ হওয়ার কারণে সাহাবাগণ তাঁদের এক শতজন বন্দীকে আজাদ করে দেন। আর এ জন্যই তিনি তাঁর জাতির মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম বরকত পূর্ণ মহিলা ছিলেন। ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৬ অথবা ৫৫ সনের রবী'উল আওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মোট ৭টি হাদীস বর্ণনা করেন।

(৯) উম্মে হাবীবা রামলা বিন্তে আবু সুফিয়ান (রা:):

তিনি নবী [ﷺ]-এর চাচাদের মেয়েদের একজন। তাই বংশের দিক থেকে স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে নিকটের। তিনি ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী। স্বামীর সাথে হিজরত করে তিনি হাবাশা (আবিসিনিয়া) গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর উবাইদুল্লাহ মুরতাদ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। পরে সেখানে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু উম্মে হাবিবা নিজের ধর্ম বিশ্বাস এবং হিজরতের উপর অটল থাকেন।

সপ্তম হিজরীর মোহররম মাসে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমর ইবনে উমাইয়া আল-জামিরী (রা:)কে চিঠিসহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। সে চিঠিতে নবী করীম [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মে হাবিবাহকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নাজ্জাশী উম্মে হাবীবার সম্মতি সাপেক্ষে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে নিজের পক্ষ থেকে চার শত দিনার মোহরানা দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁকে শারহাবীল ইবনে হাসানা [রা:]-এর সাথে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছরের ঊর্ধ্বে। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খায়বারের যুদ্ধ হতে ফিরে এসে তাঁর সাথে বাসর সজ্জা করেন। ৪২ অথবা ৪৪ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মোট ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১০) সফিয়্যা বিন্তে হুয়াই (রা:):

তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈল তথা ইয়াকুব [عليه السلام]-এর বংশের মহিলা। তিনি সপ্তম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে বন্দী হন। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ

করেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অত:পর তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। আর তাঁকে আজাদ করাই ছিল তাঁর মোহরানা। এর পূর্বে পর্যায়ক্রমে তাঁর সালাম বিন হাকীক ও কেনানাহ বিন হাকামের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। নবী [ﷺ] খায়বার হতে মাদীনার রাস্তায় (খায়বার থেকে ১২ মাইল দূরে) সাদ্দুস সাহবা নামক স্থানে তাঁর সাথে বাসর সজ্জা করেন। ৫০ অথবা ৫২ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মাদীনার কবরস্থান বাকী'উল গারকাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি সর্বমোট **১০**টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১১) মায়মূনা বিন্তে আল-হারেস (রা:):

তিনি ছিলেন আব্বাস [رضي الله عنه]-এর স্ত্রী উম্মুল ফজল লোবাবা বিন্তে হারেসের বোন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও খাদেল ইবনে ওয়ালিদ [رضي الله عنه]-এর খালা। তিনি সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে কাজা উমরা শেষ করার পর এবং সঠিক মত অনুযায়ী এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বিবাহ করেন। মক্কা হতে **৯** মাইল দূরে সারাফ নামক স্থানে তাঁর সাথে বাসর সজ্জা করেন। এর পূর্বে মাসউদ ইবনে আমর এর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং সে তালাক দেয়। এরপর বিবাহ হয় আবু রাহেম আব্দে উজ্জার সঙ্গে। হিজরী **৬১** অথবা **৬৩** বর্ষে সারাফ নামক স্থানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ঐখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি মোট **৩১**টি হাদীস বর্ণনা করেন।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উল্লেখিত **১১**জন মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সবার সাথে অবস্থান করেননি। নবীজির জিবদ্দশায় দু'জন (খাদীজা ও উম্মুল মাসাকীন) মৃত্যবরণ করেন। অন্য দু'জন মহিলা যাদের সঙ্গে ঘর সংসার হয়নি।

একজন বনি কেলাব গোত্রের এবং অন্যজন কেন্দাহ্ গোত্রের যিনি জুওয়াইনাহ নামে পরিচিত ছিলেন। এর ব্যাপারে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। এখানে সেসব উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দু'জন দাসী ছিলেন। এঁদের একজন হলো মারিয়া কিবতিয়া। মিসরের শাসনকর্তা মোকাওকেস তাঁকে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁরই গর্ভ থেকে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পুত্র সন্তান ইবরাহিম (রা:) জন্ম নেন। তিনি দশম হিজরীর ২৮ অথবা ২৯ শাওয়াল মোতাবেক ৬৩২ ইং সালের ২৭ই জানুয়ারীতে মৃত্যুবরণ করেন।

অন্য একজন দাসীর নাম ছিল রায়হানাহ বিন্তে জায়েদ (রা:)। তিনি বনি নাযীর বা বনি কুরাইযা ইহুদি গোত্রের ছিলেন। বনি কুরাইযার গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের সাথে তিনি মাদীনায় আসেন। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রায়হানাহকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখেন। তাঁর সম্পর্কে সীরাত গবেষকদের কারো কারো ধারাণা হলো: নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহ:) প্রথম মতটিকে সঠিক বলেছেন। আবু উবায়দা (রহ:) উল্লেখিত দু'জন দাসী ছাড়াও আরো দু'জন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের একজনের নাম ছিল জামীলাহ্। তিনি একটি যুদ্ধে বন্দী হিসাবে গ্রেফতার হন। আর অন্য একজন দাসীকে সহধর্মিণী জায়নাব বিন্তে জাহাশ (রা:) নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে হেবা (দান) করেন।

(খ) সন্তান-সন্ততির পরিচিতিঃ

নবী [ﷺ]-এর তিন ছেলেঃ কাসেম (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) যার উপাধি ছিল তায়্যেব ও তাহের এঁরা দু'জন খাদীজা (রাঃ) পেটের। আর তৃতীয়জন ইবরাহিম (রাঃ) মারয়া কিবতিয়্যার পেটের। তাঁরা সকলেই ছোট বয়সে মারা যান।

মেয়ে হলো চারজনঃ জায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসূম ও ফাতেমা (রাঃ)। এঁরা সকলেই খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভের। ফাতেমা (রাঃ) ছাড়া সবাই নবী [ﷺ]-এর জীবদ্দশায় মারা যান। আর ফাতেমা (রাঃ) নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর ৬ মাস পরে মারা যান।
ফতেমা (রাঃ)-এর ছেলে সন্তানরা হলেনঃ হাসান ও হুসাই [رضي الله عنهم] আর মেয়ে সন্তানরা হচ্ছেনঃ জায়নাব ও উম্মে কুলসূম (রাঃ)। আলী (রাঃ) তাঁর মেয়ে উম্মে কুলসূমের বিবাহ উমার ফারুক [رضي الله عنه]-এর সঙ্গে দেন।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কিছু বৈশিষ্ট্য

১. তিনি [ﷺ] সায়্যেদু ওয়ালাদে আদম তথা আদম (আ:)-এর সন্তানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।

২. তিনি [ﷺ] খতামুন্‌নাবিয়্যীন ওয়ালমুরসালীন তথা সর্বশেষ নবী ও রসূল।

৩. তিনি [ﷺ] সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৪. তিনি [ﷺ] সর্বপ্রথম হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

৫. তিনি [ﷺ] আল্লাহ তা'য়ালার খালীল যেমন ইবরাহিম [عليه السلام] আল্লাহর খালীল।

৬. তিনি [ﷺ] ও তাঁর উম্মত অন্যান্য নবী-রসূলদের উপর ৫টি বিশেষ জিনিস দ্বারা বৈশিষ্ট্যি মণ্ডিত।

৭. তিনি [ﷺ] মা'সূম তথা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আগের ও পরের সমস্ত ভুল মাফ করে দিয়েছেন।

৮. তিনি [ﷺ] আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত মখলুক (সৃষ্টি)।

৯. হাশরের ময়দানে তাঁর হাউজে কাওছার হবে সবার চেয়ে বড় হাউজ।

১০. কিয়ামতের ময়দানে সকলে বলবে: নাফসী, নাফসী। আর একমাত্র তিনি [ﷺ] বলবেন: ইয়াা রব্বী উম্মাতী, ইয়াা রব্বী উম্মাতী।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কিছু নাম ও উপাধিঃ

নবী [ﷺ]-এর একশতের বেশি নাম ও উপাধি রয়েছে। তার মধ্য হতে এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো।

১. মুহাম্মদ [ﷺ]
২. আহমাদ [ﷺ]
৩. আল-হাশের [ﷺ]
৪. আল-‘আকেব [ﷺ]
৫. আল-মাহী [ﷺ]
৬. নাবীউত্ তাওবাহ [ﷺ]
৭. নাবীউর্ রহমাহ [ﷺ]
৮. নাবীউল্ মালাহেম [ﷺ]
৯. খালীলুল্লাাহ [ﷺ]
১০. হাবীবুল্লাহ [ﷺ]
১১. হাবীবুর্রহমান [ﷺ]
১২. আদ-দা‘য়ী ইলাল্লাহ [ﷺ]
১৩. দা‘ওয়াতু ইবরাহিম [ﷺ]
১৪. রাহমাতুল লিল‘আলামীন [ﷺ]
১৫. রউফ [ﷺ]
১৬. রহীম [ﷺ]
১৭. আররসূল [ﷺ]
১৮. আন্নাবী [ﷺ]
১৯. সিরাজাম মুনীরাা [ﷺ]
২০. সায়্যেদু ওয়ালাদে আদাম [ﷺ]
২১. আল-মুশাফফা‘ [ﷺ]

২২. আশশাফী‘ [ﷺ]
২৩. আল-মুদ্দাসসির [ﷺ]
২৪. আল-মুজজাম্মিল [ﷺ]
২৫. আল-মুস্তফাা [ﷺ]
২৬. আল-মুজতাবাা [ﷺ]
২৭. আলমুকাফফা [ﷺ]
২৮. আল-বাশীর [ﷺ]
২৯. আননাযীর [ﷺ]
৩০. আবুল কাসেম [ﷺ] (উপনাম)

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর শারীরিক গুণাবলিঃ

১. বেশি লম্বা ছিলেন না এবং বেশি খাটও ছিলেন না। বরং মাঝারি গঠনের ছিলেন।
২. বেশি ফর্সা ছিলেন না এবং বেশি শ্যামবর্ণের ছিলেন না। বরং লাল ফর্সা ছিলেন।
৩. তাঁর মাথার চুল না ছিল কোঁকড়ানো আর না কোমল বরং মাঝামাঝি অবস্থার ছিল।
৪. মাথা ছিল অনেক বড়, যা বাহাদুরদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
৫. শরীরের হাড়ের জোড়গুলো ছিল বড় বড়, যা মহা শক্তিশালীর পরিচয়।
৬. সবচেয়ে সুন্দর ও লাবণ্যময় তথা সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় ও গোল চেহরার মানুষ ছিলেন।
৭. চোখদ্বয় ছিল যেন সুরমা লাগানো এবং নাক ছিল পাতলা।
৮. দুই কাঁধের মাঝের দূরত্ব বেশি তথা দীর্ঘ প্রসস্ত সিনা ছিল।
৯. বুক ভরা ঘন লম্বা দাঁড়ি ছিল।

১০. মৃত্যুর পূর্বে হাতে গণনা করা যেত এমন কিছু দাড়ি পাকা ছিল।
১১. শরীরের সুগন্ধি ছিল তিব্র মেস্কের মত।
১২. হাত ছিল রেশমি কাপড়ের চেয়েও নরম।
১৩. শরীর ঘামলে ঘাম মুক্তার দানার মত চমকাত এবং মেস্কের মত খোশবু ছড়াতো।
১৪. মুখে সর্বদা মুচকি ও মৃদু হাসি থাকত।
১৫. মুখমণ্ডল ছিল বৃহৎ ও চোখের পলক ছিল লম্বা।
১৬. পায়ের গোড়ালিতে গোস্ত ছিল কম।
১৭. শরীর খুব মোটা ছিল না এবং খুব পাতলাও ছিল না। বরং মাঝারি ধরণের ছিল।
১৮. দুই হাত-পা ছিল বিরাট এবং হাতের তালু ছিল প্রসস্থ।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

নবী করীম [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এমন অসাধারণ, অতুলনীয় এবং সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যা আলোচনা ও নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্র ছিল অনন্য সুন্দর। অসচ্চরিত্রতার এক বিন্দুও তাঁর মধ্যে ছিল না। এখানে সমান্য কিছু উল্লেখ করা হলো:

¿ তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব রূপ। যেমনটি মা আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে।
¿ তিনি [ﷺ] বিশুদ্ধ ও প্রাণজল ভাষায় কথা বলতেন।
¿ তিনি [ﷺ] ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল মানুষ। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকার পরেও ক্ষমা প্রদর্শন এবং বিপদে ধৈর্যশীলতা ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

¿ তাঁর দানশীলতা ও দয়াশীলতা পরিমাপ করা ছিল অসম্ভব। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি দানশীল। কখনোই এমন হয় নি যে, কেউ তাঁর কাছে চেয়েছে অথচ তিনি তা প্রদানে অসম্মতি জানিয়েছেন।

¿ বীরত্ব ও বাহাদুরীর ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল সবার ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অবিচল থাকতেন। আলী ইবনে আবী তালিব (রা:) বলেন: যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেতো এবং কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো তখন আমরা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে কেউ সক্ষম হতো না।

¿ তিনি [ﷺ] ছিলেন সর্বাধিক লাজুক, সবার চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ, পাক-পবিত্র, সত্যবাদী এবং বিশিষ্ট আমানতদার।

¿ তিনি [ﷺ] অতি বিনিয়ী, নম্র ও ভদ্র ছিলেন। বিনয় ও নম্রতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বাদশাহদের সম্মানে তাদের সেবক ও গুণগ্রাহীরা যে রকম বিনয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সম্মানে সাহাবাদের সেভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন।

¿ তিনি [ﷺ] গরিব-মিসকিনের সেবা-যত্ন ও ফকিরদের সাথে উঠাবসা করতেন। ধনী, ফকির, ক্রীতদাস ও ভদ্র সকল প্রকার মানুষের দা'ওয়াত (নিমন্ত্রণ) গ্রহণ করতেন।

¿ তিনি [ﷺ] মিসকিনদের ভালবাসতেন এবং তাদের জানাজায় হাজির হতেন।

¿ তিনি [ﷺ] যে কোন রোগীদের পরিদর্শন করার জন্য যেতেন।
¿ আপন সাহাবীদের সঙ্গে তাঁদেরই সাধারণ একজনের মত হয়ে বসতেন।
¿ তিনি [ﷺ] অঙ্গীকার পালনে ছিলেন অগ্রগামী।
¿ তিনি [ﷺ] আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অতিমাত্রায় খেয়াল রাখতেন।
¿ তিনি [ﷺ] মানুষের সাথে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতেন।
¿ তিনি [ﷺ] স্বভাবগতভাবে কখনো অশালীন ও অশ্লীল কথা বলতেন না। আর ইচ্ছাকৃতভাবেও তিনি কখনো অশ্লীল কথা বলেননি।
¿ তিনি [ﷺ] কাউকে কখনো অভিশাপ দিতেন না।
¿ তিনি [ﷺ] বাজারে গেলে উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি ও হৈচৈ করতেন না।
¿ তিনি [ﷺ] মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দিতেন না।
¿ তিনি [ﷺ] অসদ্ব্যহারের বদলা সদ্ব্যবহার দ্বারা দিতেন।
¿ তিনি [ﷺ] কখনো নিজের জন্য রাগ ও কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ন করা হলে তিনি [ﷺ] আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।
¿ হকের ব্যাপারে তাঁর কাছে নিকটের ও দূরের এবং সবল ও দুর্বল সকলেই সমান ছিল।
¿ তিনি [ﷺ] জোর তাকিদ দিয়ে এরশাদ করেছেন: মানুষ হিসাবে সকলেই সমান শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই একজন অপরজনের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা পাবে।
¿ তিনি [ﷺ] বলেছেন: পূর্বের জাতির ধ্বংসের কারণ ছিল: ভদ্র লোকেরা চুরি করলে ছেড়ে দিত আর দুর্বলরা চুরি করলে শাস্তি

প্রদান করত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন: যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, তবে তার হাত কেটে দিতাম।

- তিনি [ﷺ] নিজ সাহাবাদের খবরাখবর রাখতেন এবং সবার কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন।
- তিনি [ﷺ] উঠতে বসতে সর্বদা আল্লাহর জিকির করতেন।
- তাঁর চেহরায় সবসময় স্মিতভাব তথা প্রফুল্ল ও হাস্য বিরাজ করতো।
- তিনি [ﷺ] ছিলেন নরম মেজাজের মহামানব। রুক্ষতা ছিল তাঁর স্বভাব বিরোধী। কখনো বেশি জোরে কথা বলতেন না।
- তিনি [ﷺ] কারো প্রতি রুষ্ট হলেও তাকে ধমক দিয়ে কথা বলতেন না।
- তিনি [ﷺ] কারো প্রশংসা করার সময় অতিরঞ্জন করতেন না।
- পানাহারের জিনিসের সমালোচনা করতেন না। পছন্দ হলে খেতেন আর পছন্দ না হলে ছেড়ে দিতেন।
- মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরিবারে একমাস দু'মাস অতিবাহিত হতো কিন্তু তাঁর বাড়ীর চুলায় আগুন জ্বলতো না। তাঁদের খাদ্য ছিল শুধুমাত্র খেজুর ও পানি।
- তিনি [ﷺ] নিজের জুতা ও কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। এ ছাড়া ঘরের সাধারণ কজে স্ত্রী-পরিবারকে সাহায্য করতেন।
- তিনি [ﷺ] কোন গরিবকে তার দারিদ্রতার কারণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না এবং কোন বাদশাহকে তার বাদশাহির জন্য ভয় করতেন না।
- তিনি [ﷺ] ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরে আরোহন করতেন।

¿ তিনি [ﷺ] সর্বাধিক মুচকি হাসি হাসতেন। বেশি বেশি বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সবার চেয়ে প্রফুল্লচিত্ত থাকতেন।

¿ তিনি [ﷺ] সুগন্ধি ভালবাসতেন এবং দুর্গন্ধ অপছন্দ করতেন।

¿ আল্লাহ তাঁর মধ্যে পূর্নাঙ্গ উত্তম চরিত্রসমূহ ও অতি উত্তম কার্যাদির সমাহার ঘটিয়েছিলেন।

¿ আল্লাহ তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেন যা তাঁর আগের-পরের কাউকেও দান করেননি।

¿ তিনি [ﷺ] উম্মী তথা লেখা-পড়া জানতেন না। মানুষদের মধ্য হতে তাঁর কোন শিক্ষক ছিল না। বরং তিনি আল্লাহর নিকট হতে জিবরীল [عليه السلام]-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল করীম পেয়েছেন।

¿ তিনি [ﷺ] উম্মী হিসাবে বড় হয়েছেন, যার কারণে মিথ্যুকদের অপবাদের পথ বন্ধ হয়েগেছে যে, তিনি কুরআন নিজেই লিখেছেন বা শিখেছেন কিংবা অন্য কোন কিতাব হতে পড়েছেন।

স্মরণ রাখতে হবে যে, নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর যে সকল গুণাবলীর বিষয়ে আলোচনা হলো তা তাঁর অসাধারণ ও অতুলনীয় গুণাবলীর সামান্যমাত্র চিত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গুণাবলী এতো ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে, সেসব গুণাবলীর আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয় এবং চরিত্র বৈশিষ্টের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিরূপণ করাও সম্ভব নয়।

মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এ মহান মানুষের পরিচয় এই যে, তিনি মানবতার সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন।

তিনি মহান রব্বুল 'আলামীনের পবিত্র আলোক আভায় এমনভাবে আলোকিত ছিলেন যে, কুরআন করীমকেই তাঁর চরিত্রের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ত্রিশ পারা পবিত্র কোরআনের বাস্তব চিত্র।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
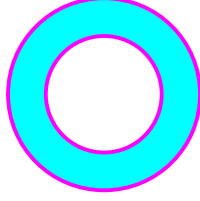
রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কিছু আবদ (শিষ্টাচারিতা):

১. সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সন্নিকটে থাকতেন। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ [ؓ] বলেন: আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো নবী [ﷺ] আমাকে বাঁধা দেননি। আর যখনই আমাকে দেখেছেন তখনই মৃদু হাসি হেসেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

নবী [ﷺ] সাহাবাদের সঙ্গে হাসি-মজাক করতেন। আনাস [ؓ] বলেন: নবী [ﷺ] সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। আমার এক ছোট ভাই ছিল যার নাম হলো আবু উমাইর। সে একটি ছোট পাখী নিয়ে খেলা করত। নবী [ﷺ] এসে তাকে দেখে বলতেন: আবু উমাইর তোমার পাখীর খবর কি? [বুখারী ও মুসলিম]

তিনি শুধুমাত্র কথা দ্বারাই মজাক করতেন না বরং কাজ দ্বারাও করতেন। আনাস ইবনে মালেক [ؓ] থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য মানুষ যার নাম ছিল জাহের ইবনে হারাম। লোকটি নবী [ﷺ]কে হাদিয়া পাঠাত। সে একদিন আসবাব-পত্র বিক্রি করতে ছিল। এমন সময় নবী [ﷺ] তাকে পিছন থেকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন যে, সে দেখতে পাচ্ছিল না। সে বলল: আমাকে ছাড়ুন, কে আপানি? সে নবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে যখন জানতে পারল যে নবী [ﷺ], তখন সে নিজের পিঠকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বুকের সাথে লাগিয়ে দিল। নবী [ﷺ] বললেন: এই দাসটি কে ক্রয় করবে? তখন জাহের বলল: হে আল্লাহর রসূল আপনি কি আমাকে সস্তা-মন্দা পেয়েছেন! নবী [ﷺ] বললেন: বরং তুমি আল্লাহর নিকটে মন্দা নও অথবা

বলেন: তুমি আল্লাহর কাছে অনেক মূল্যবান ও দামী। [সহীহ ইবনে হিব্বান]

২. যে সকল বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল নেই সে ব্যাপারে তিনি সাহাবাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আবু হুরাইরা [ﷺ] বলেন: সাহাবীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এরচেয়ে অধিক আর কাউকে দেখিনি। [তিরমিযী]

৩. মুসলিম বা কাফের সকল প্রকার রোগীদের পরিদর্শন করতেন। তিনি সাহাবাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও অবস্থাদির খবরা-খবর নিতেন। যদি কোন রোগীর খবর পেতেন তাহলে তিনি ও সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে জলদি করে তার পরিদর্শনে যেতেন। আর ইহা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং কাফেরদের জন্যেও ছিল। আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] বলেন: একজন ইহুদির ছেলে নবী [ﷺ]-এর খেদমত করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী [ﷺ] তার পরিদর্শনে যান। তিনি তার মাথার কাছে বসে বললেন: ইসলাম গ্রহণ কর। ছেলেটি তার পার্শ্বে বসা বাবার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বাবা বলল: আবুল কাসেমের (নবীর) আনুগত্য কর। এরপর ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল। নবী [ﷺ] সেখান থেকে বের হয়ে বললেন: "ঐ আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি একে জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দান করলেন।" [বুখারী]

৪. ভাল কাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তার প্রতিদান দিতেন। নবী [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের নিকট যে আল্লাহর নামে আশ্রয় চাইবে তাকে আশ্রয় দিবে। আর যে আল্লাহর নামে চাইবে

তাকে দান করবে। আর যে তোমাদেরকে দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করবে তার ডাকে সাড়া দিবে। আর যে তোমাদের জন্য ভাল কিছু করবে তার প্রতিদান দিবে। যদি প্রতিদানের জন্য কিছু না পাও তাহলে তার জন্য দোয়া করবে যা প্রতিদান স্বরূপ পরিগণিত হবে।" [আবু দাউদ]

আয়েশা (রা:) নবী [ﷺ] সম্পর্কে বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন। [বুখারী]

৫. সুগন্ধি ও সুন্দর জিনিসকে পছন্দ করতেন। "তিনি [ﷺ] কখনো সুগন্ধি ফেরৎ দিতেন না।" [সহীহুল জামে' হা:৪৮৫২] তিনি আরো বলেন:"কারও প্রতি সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন ফেরৎ না দেয়। কারণ, ইহা খোশবু ছড়ায় এবং বহন করতে হালকা।" [সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা: ৪১৭২]

৬. প্রতিটি ভাল ও কল্যাণকর কাজে সুপারিশ করা পছন্দ করতেন। ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা:)-এর স্বামী মুগীস (রা:) একজন দাস ছিল। বারীরা আজাদ হয়ে গেলে স্বামীকে অপছন্দ করে। মুগীস তার পেছনে পেছনে মদিনার অলি-গলিতে দাড়ি ভিজিয়ে অশ্রুসজল করে ঘুরে বেড়ায়। আর বারীরা তাকে ঘৃণা করে। নবী [ﷺ] আব্বাস [رضي الله عنه]কে বলেন: বারীরাকে মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসকে বারীরার ঘৃণার ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করেন না? নবী [ﷺ] বারীরাকে বলেন: যদি মুগীসের নিকট ফিরে যেতে? রাবীরা বলে: আপনি কি আমাকে নির্দেশ করছেন? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি সুপারিশ করছি মাত্র। বারীরা বলে: তার আমার কোন প্রয়োজন নেই। [বুখারী]

৭. নিজের কাজ নিজেই এবং স্ত্রীগণকে পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন। আয়েশা (রা:)কে নবী [ﷺ] তাঁর বাড়িতে কি করতেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: তিনি একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় সেলাই, ছাগলের দুধ দোহন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। [সহীহুল জামে' হা: ৪৯৯৬]

আয়েশা (রা:) আরো বলেন: তিনি তাঁর স্ত্রী-পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। তবে তিনি [ﷺ] যখন আজান শুনতেন তখন সালাতের জন্য দ্রুত বের হয়ে চলে যেতেন। [বুখারী]
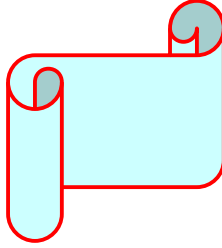
মহানবী [ﷺ]-এর কিছু মু'জিযা যা নবুয়াতের দলিল

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: নবী [ﷺ]-এর মু'জিযা ও নবুয়াতের প্রমাণ প্রায় এক হাজারেরও অধিক। নবী-রসূলগণের মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের রিসালাতের সত্যায়ন করেন।

মু'জিযা তথা অলৌকিক জিনিস মানুষের শক্তির বাইরের হয়ে থাকে। প্রতিটি নবীর মু'জিযা সাধারণত: তাঁর যুগের অবস্থার সাথে মিল রেখেই হয়ে থাকে। যেমন: মূসা (আ:)-এর সময় জাদুর বাহাদুরী চলত। তাই তাঁর মু'জিযা ছিল লাঠি, যা দ্বারা সাগরে আঘাত করলে রাস্তা হয়েছিল এবং অজগর হয়ে জাদুকরদের সমস্ত সাপকে খেয়ে ফেলেছিল। আর ঈসা (আ:)-এর যুগে ছিল চিকিৎসার বাহাদুরী। তাই তাঁকে এমন চিকিৎসার মু'জিযা দান করেন, যার দ্বারা তিনি কুষ্ঠরোগী, জন্মান্ধের মত জটিল রোগের চিকিৎসা করতেন।

আর মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন ধরণের মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী একত্রিভূত করেছেন। তাঁর প্রতি নাজিল করেছেন এমন এক মহাগ্রন্থ যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আজ পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি। আল-কুরআনকে কাফের, খ্রীষ্টান ও ইহুদিরা অহংকার ও শত্রুতাবশ:ত বাইরে অস্বীকার করলেও অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করত।

৯ প্রকার মু‘জিযার সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনাঃ

প্রথম প্রকারঃ

অহি দ্বারা কিছু অদৃশ্য জিনিসের খবর প্রদানঃ

গায়েব তথা কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালাই জানেন। আসমান-জমিনের অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে গায়েবের খবর তাঁর নবী-রসূলদের অবহিত করান। এ ছাড়া অন্য কাউকে জানান না। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েবের জ্ঞান দাবী করলে বা কারো ব্যাপারে বিশ্বাস রাখলে ইহা সম্পূর্ণ বড় কুফরি ও বড় শিরক।

আল্লাহ তা‘আলা নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে কিছু গায়েবের খবরাদি জানিয়ে তাঁর সুমহান মর্যাদা দান এবং নবুয়াত ও রিসালাতের সত্যায়ন করছেন। এগুলো দুই প্রকারঃ

(১) দুনিয়ার গায়েবের খবরাদি। ইহা আবার দুই প্রকারঃ

(ক) যা সংঘটিত হয়েগেছে।

(খ) যা এখনও সংঘটিত হয়নি।

(২) আখেরাতের গায়েবের খবরাদি।

(ক) দুনিয়ার গায়েবের খবর যা সংঘটিত হয়েগেছেঃ

১. ‘উমাইয়া ইবনে ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণের খবর দান। সে নবী [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চরম শত্রু ছিল এমনকি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে হত্যা করতে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

---

[১]. হায়াতুস সাহাবা ১/১৩৩-১৩৫

২. আবু সুফিয়ান উমাইয়্যা ইবনে খালাফের হত্যার খবর। নবী [ﷺ] বলেন: মুসলমানরা তাকে হত্যা করবে। এ খবরটি তাকে সা'দ ইবনে মু'আয জানায়। উমাইয়্যা এ খবর বিশ্বাস ক'রে এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করে এবং রাস্তা থেকে ভেগে যাওয়ার সুযোগ খোঁজ করে। কিন্তু আবু জাহ্‌লের চাপে পড়ে হাজির হতেই হয়। আর পরিশেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানরা সত্যিই তাকে হত্যা করেন।[১]

৩. খায়বারের ইহুদি মহিলা বিষ মাখানো ছাগলের গোস্ত নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে খাবার জন্য পেশ করলে তিনি অহির দ্বারা অবগত হন। তিনি ইহুদিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা সত্যতা স্বীকার করে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য পাককৃর গোস্তকে বাক শক্তি দান করেন।[২]

৪. পারস্য সম্রাট কেসরার হত্যর খবর দান। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কেসরার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা:) দ্বারা ইসলামের দা'ওয়াত পাঠালে সে রাগান্বিত হয়ে পত্রটি ছিড়ে ফেলে বলে: সে (মুহাম্মদ) আমার একজন গোলাম হয়ে আমার কাছে এ ধরণের পত্র লেখে? দা'ওয়াত নামা ছিড়ে রাগ মিটে না বরং তার ইয়েমেনের গভর্নর বাজানকে লেখে: ওখান থেকে দু'জন শক্তিশালী মানুষকে পাঠিয়ে মুহাম্মদ [ﷺ]কে বেঁধে আমার নিকট হাজির করবে। দুইজন লোক মদীনায় পৌঁছে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলে: আমাদের সঙ্গে চল। তাদের গোঁফ ছিল লম্বা আর দাড়ি ছিল মুণ্ডানো। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

[১]. বুখারী

[২]. বুখারী, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত।

ওয়াসাল্লাম] তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপছন্দ করলেন এবং বললেন: তোমাদেরকে এ কাজের জন্য কে নির্দেশ করেছে? তারা বলল: আমাদের প্রভু কেসরা। তিনি [ﷺ] বললেন: কিন্তু আমার প্রতিপালক গোঁফ ছোট করতে এবং দাড়ি না মুণ্ডাতে নির্দেশ করেছেন। অত:পর তিনি তাদেরকে বললেন: আজ ফিরে যাও কাল আবার আস। এদিকে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অহি দ্বারা জানতে পারলেন যে, আল্লাহ কেসরার ছেলেকে তার উপর কর্তৃত্বদান ক'রে তাকে হত্যা করিয়েছেন। সকালে তারা দুইজন আসলে তিনি [ﷺ] বলেন: আমার প্রতিপালক তোমাদের রাজার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করিয়েছেন। তারা ইয়েমেনে ফিরে বাযানকে খবর দিল এবং পরে কেসরার ছেলে শিরওয়াহ-এর পক্ষ থেকে সত্যিই পত্র আসল যে, সে এখন বাদশাহ তারই যেন আনুগত্য করা হয়। বাযান মিলিয়ে দেখল যে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর খবর সঠিক। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামে ইয়েমেনবাসীও ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

৫. মক্কায় খুবাইব ইবনে 'আদী (রা:)-এর শাহাদাতের সময় মদীনা থেকে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার সালামের উত্তর দেন। ওহুদের যুদ্ধের পর 'উযাইল ও কারাহ গোত্রের লোকজন এসে বলে: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনার কিছু সাহাবী প্রেরণ করুন। তিনি ৬জন সাহাবীকে নির্বাচন করেন যাদের মধ্যে

---

[১]. সীরাতে ইবনে হিশাম।

ছিলেন খুবাইব (রা:)। তাঁরা গোপনে হুযাইল গোত্রের পার্শ্বে রাজী' নামক স্থানে পৌছেন। ঐদিকে তারা খবর পেয়ে ১০০জন অশ্ববাহিনী সাহাবাদের পাকড়াও করার জন্য আসলে তাঁরা একটি পাহাড়ের উপর আশ্রয় নেন। তারা হত্যা না করার ওয়াদা করে পাহাড় থেকে নামিয়ে খুবাইব (রা:) ও জায়েদ ইবনে দাছেনা (রা:)কে ছাড়া একে একে সবাইকে হত্যা করে। জায়েদকে সফওয়ান ইবনে উমায়্যা খরিদ করে এবং বদরের যুদ্ধে তার বাবাকে মুসলমানারা যে হত্যা করেছিল তার বদলায় হত্যা করে। সফওয়ান তাঁকে হত্যার জন্য তার দাস নাস্তাসকে দিয়ে বলে: একে মক্কার অদূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে এসো। কুরাইশরা সকলে হত্যাকাণ্ড দেখার জন্য একত্রিত হয়। সেখানে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও ছিল। সে জায়েদকে শক্ত করে বাঁধা অবস্থায় দেখে বলে: আচ্ছা তুমি কি পছন্দ কর যে, তোমার জায়গায় মুহাম্মদকে হত্যা করা হোক আর তুমি তোমার পরিবারে থাক? উত্তরে জায়েদ [ﷺ] বলেন: আমার স্থানে মুহাম্মদের গায়ে একটি কাঁটা ফুটুক আর আমি বাড়িতে থাকি তাও পছন্দ করি না। তখন আবু সুফিয়ান বলে: মুহাম্মদকে তার সঙ্গীরা যেমন ভালবাসে কোন মানুষ আর কাউকে এমন ভালবাসে না। এরপর নাস্তাস জায়েদ [ﷺ]কে নির্মমভাবে হত্য করে।

অন্য দিকে খুবাইব (রা:)কে মক্কার হারেছ ইবনে 'আমেরের ছেলেরা ক্রয় করে নেয়। খুবাইব [ﷺ] বদরের যুদ্ধে হারেছকে হত্যা করেছিলেন। তারা তাঁকে তাদের বাবার হত্যার বদলে একটি ঘরের মধ্যে আটক করে রাখে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর খাওয়ার জন্য জান্নাতের বড় বড় আঙ্গুরের থোকা আসত। তাঁকে

হত্যার পূর্বে তিনি খুর দ্বারা যে সব লোম পরিস্কার করা দরকার তা করেন। আর সুন্দর করে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করেন। তিনিই মুসলমানদের জন্য হত্যার পূর্বে দু'রাকাত সালাত পড়ার সর্বপ্রথম সুন্নত জারি করেন।

এরপর কাফেররা তাঁকে একটি শূলিতে চড়ালে তিনি আসমানের দিকে চোখ উঠিয়ে বলেন: হে আল্লাহ! আমরা তোমার রসূলের রিসালাত পৌঁছিয়েছি। অতএব, আমাদের সঙ্গে কাফেররা যা করেছে তার খবর আগামি কাল তোমার নবীর নিকট পৌঁছে দিও। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ৫৫০কি: মি: দূর থেকে মদীনায় সাহাবাদেরকে তাঁদের শাহাদতের খবর দেন এবং বলেন: ওয়া 'আলাইকস্‌সালাস খুবাইব, ওয়া 'আলাইকাস্‌সালাস, খুবাইব। অত:পর বলেন: খুবাইবকে কুরাইশরা হত্যা করেছে।[১]

৬. নবম হিজরিতে নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড প্রতিকুলে এবং গরম ছিল প্রচুর ও রাস্তা ছিল বড় দূর্গম। এ সময় কিছু মানুষ যুদ্ধ থেকে পিছ পা হচ্ছিল তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোন প্রকার শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। যদি কারো ব্যাপারে বলা হতো: অমুক অংশগ্রহণ করেনি উত্তরে তিনি বলেন: বাদ দাও! যদি আল্লাহ তার মঙ্গল চান, তাহলে তোমাদের সঙ্গে তাকে মিলিত করাবেন। আর যদি এর অন্য কিছু হয়, তাহলে আল্লাহ তার থেকে তোমাদেরকে রেহাই দিবেন।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং

নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর সাহাবা কেরাম উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে তাবুকের দিকে পথ অতিক্রম করতে ছিলেন। আবু যার (রা:) সর্বোত্তম সাহাবাদের একজন। তিনি একটি দুর্বল উটের উপর আরোহণ করে পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন যার ফলে তিনি পিছে পড়েন যান।

কিছু সাহাবী পেছনের দিকে লক্ষ করে দেখলেন আবু যার (রা:)-এর কোন খবর নেই। তাঁরা বললেন: ইয়াা রাসূলুল্লাহ! [ﷺ] আবু যার বুঝি আসেনি। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অন্যান্যদের মতই বললেন: বাদ দাও! যদি আল্লাহ তার মঙ্গল চান তাহলে তোমাদের সঙ্গে তাকে মিলিত করাবেন। আর যদি এর অন্য কিছু হয়, তাহলে আল্লাহ তার থেকে তোমাদেরকে রেহাই দিলেন।

এদিকে আবু যার (রা:) তার দুর্বল উট নিয়ে বড় বিপদে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত উট ছেড়ে দিয়ে নিজের সামান-পত্র পিঠে নিয়ে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথ ধরার জন্য গরম বালুতে দ্রুত চলতে লাগলেন।

(খ) দুনিয়ার গায়েবের খবর যা এখনো সংঘটিত হয়নি:

১. ইহুদিদের হত্যার ব্যাপারে গাছ ও পাথরের সাহায্য করার সংবাদ:

কিয়ামতের পূর্বে মুসলিমরা যখন ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তারা গাছ ও পাথরের পিছনে লুকাবে। এ সময় গাছ ও পাথর বলবে: হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই যে ইহুদি আমার পিছনে লুকিয়ে আছে, আসুন এবং তাকে হত্যা করুন।

কিন্তু গারকাদ গাছ ব্যতিরেকে। কারণ, ইহা ইহুদিদের গাছ। [মুসলিম]

২. ইমাম মাহ্‌দির আবির্ভাবের সংবাদঃ

নবী [ﷺ]-এর পরিবার তথা ফাতেমা (রা:)-এর সন্তান হাসান [رضي الله عنه]-এর বংশ থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। সে সময় সমস্ত জমিন ইনসাফ ও ন্যায়পরয়ণতা দ্বারা ভরে যাবে। [আবু দাউদ]

৩. ঈসা [عليه السلام]-এর অবতরণ এবং মাসীহুদ্দাজ্জালকে হত্যার সংবাদঃ

তিনি কিয়ামতের পূর্বে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে একটি সাদা মিনারাতে অবতরণ করবেন। এরপর তিনি [عليه السلام] দাজ্জালকে হত্যা করবেন। [মুসলিম]

৪. দুনিয়ার শেষ, জমিন ধ্বংস এবং তার উপরের সকল সৃষ্টিরাজির প্রলয় সম্পর্কে সংবাদ দান। [সূরা তহা:১০৫-১০৭ ও সূরা রাহমান:২৬-২৭]

(২) আখেরাতের গায়েবের খবরাদিঃ

১. মৃত্যুর সময় ও কবরে মানুষের অবস্থার খবরাদি। [মুসনাদে আহমাদ]

২. পুনরুত্থান, কিয়ামত ও তার ভয়ানক অবস্থার সংবাদ। [সূরা হজ্বঃ ১-২ ও ৫]

৩. কিয়ামতের দিন নবী [ﷺ]-এর শাফা'য়াত তথা সুপারিশের সংবাদ। [বুখারী]

৪. কিয়ামতের দিন নবী [ﷺ]-এর হাউজ কাওসার বিষয়ে খবর দান। [মুসলিম]

৫. জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজির সংবাদ। [কুরআনের বহু স্থানে ও বুখারী-মুসলিম]

৬. জাহান্নাম ও তার শাস্তির সংবাদ। [কুরআনের বহু স্থানে ও বুখারী-মুসলিম]

৭. জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়ী জীবনের সংবাদ। [কুরআনের বহু স্থানে ও বুখারী হা: ৬৫৪৮]
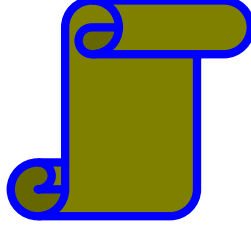
দ্বিতীয় প্রকারঃ
ঊর্ধ্ব জগতের কিছু মু‘জিযা

১. আল-কুরআনুল করীমঃ

কুরআন করীম সর্বশেষ আসমানি কিতাব এবং সবচেয়ে বড় মু‘জিযা। ইহা মহান আল্লাহ তা‘য়ার বাণী। আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআনকে জিবরাঈল [عليه السلام]-এর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীব [ﷺ]-এর প্রতি দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাজিল করেন। কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা নাস। কুরআন মখলুক তথা আল্লাহর কোন সৃষ্টি নয়। বরং ইহা আল্লাহর পবিত্র বাণী যা তাঁর গুণাবলীর একটি বিশেষ গুণ। আর আল্লাহর গুণ মখলুক নয়; কারণ মখলুক মরণশীল এবং কুরআন কখনই নি:শেষ হবে না।

কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত এক শাশ্বত মু‘জিযা। আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআনের মত কুরআন বা তার মত দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা বানানোর চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।
[সূরা বনি ইসরাঈল:৮৮, সূরা হুদ:১৩ ও সূরা বাকারা:২৩ ইউনুসঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য]

Ø কুরআন সবচেয়ে বড় মু‘জিযা হওয়ার কারণঃ

১. কুরআন মজীদে আল্লাহর সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীর সমাহার। এর মাঝে রয়েছে নবী-রসূলদের বিভিন্ন জাতির খবরাদি ও দ্বীনের মূলনীতি মালা।
২. মহানবী [ﷺ] একজন নিরক্ষর মানুষ যিনি লেখা-পড়া জানতেন না। তিনি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি দ্বারা প্রাপ্ত

হয়েছেন। এর চ্যালেঞ্জের মোকবিলা করতে আজ পর্যন্ত বড় বড় সাহিত্যিকরা অপারগ হয়েছে।

৩. কুরআন মহানবীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শাশ্বত এক মু'জিযা হয়ে থাকবে।

৪. কুরআনুল করীম সর্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও সংশয় এবং প্রবৃত্তির জন্য এক মহাঔষধ।

৫. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পাঠ করা এক উত্তম এবাদত। প্রতিটি অক্ষর তেলাওয়াতে রয়েছে দশটি করে সওয়াব। তা ছাড়া কুরআন তার পাঠকারীর জন্য রোজ কিয়ামতে সুপারিশও করবে।

২. অঙ্গুলি ইশারায় চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণঃ

মুশরেকরা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতো তা হতে একটি হলোঃ কখনো কখনো তারা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বিভিন্ন প্রকার নিদর্শন দেখতে চাইত। যেন তাতে রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজ অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা একদা রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বললঃ তাদেরকে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত ক'রে দেখাতে।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করে চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি ইশারা করার সাথে সাথে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। তারা এ দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দেখলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমান আনল না। বরং বললঃ মুহাম্মদ আমাদেরকে জাদু করেছে। কেউ কেউ বললঃ যদি তাই হয় তাহলে সমস্ত মানুষকে তো জাদু করতে সে পারবে না। তাই তোমরা সঠিক ব্যাপার জানতে হলে যারা মক্কার বাহিরে সফরে

ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। অত:পর তারা মক্কার বাহির হতে আগত কাফেলাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল: হ্যাঁ, আমরাও ঐ সময় চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত অবস্থায় দেখেছি। কুরাইশরা তাদের কথা শুনার পরও মহা সত্যকে কবুল না ক'রে কুফুরির উপর অটল থাকল।

৩. ইস্‌রা ও মেরাজঃ

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কার বাহিরে দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন। সাফল্যতা এবং জুলুমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে দা'ওয়াতের দূর্গম পথ। ঠিক এমনি একটি সময়ে দূর গগনে চকমক ক'রে ফুটে উঠেছে আশার উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাফেরদের পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রকার জুলুম-অত্যাচার সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। আর আবু তালিব ও খাদীজা (রা:)-এর বিদায় বেদনায় নবীজি যখন কাতর, ঠিক এমন সময় তাঁর দয়াময় রবের পক্ষ থেকে আসল এক বিরাট সান্তনা। যা সব ব্যথা ভুলিয়ে এক নতুন জীবনের শক্তির সঞ্চার করল। ঘটল "ইসরা" তথা মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ। আর "মেরাজ" তথা মসজিদে আকসা হতে সপ্তম আকাশে মহান আল্লাহর আরশে আযীমের অতি নিকট পর্যন্ত ঊর্ধ্বগমনের ঐতিহাসিক ঘটনা।

Ø কখন ঘটেছিল এ ঘটনা?

কুরআন ও সহীহ হাদীসে মেরাজের দিন বা তারিখের কোন প্রমাণ নাই। তাই এ নিয়ে সীরাত গবেষকদের অনেক মতভেদ রয়েছে। এর মধ্যে ৬ টি মত উল্লেখ যোগ্য। যেমন:

১. নবুয়াতের প্রথম বছরে। এ মতটি ইমাম তাবারী (রাহ:)-এর।

২. নবুয়াতের পঞ্চম বছরে। এ মতটি ইমাম কুরতুবী ও ইমাম নববী (রহঃ)-এর।

৩. নবুয়াতের দশম বছরের রজব মাসের ২৭ তারিখে। এ মতটি আল্লামা মানসূরপুরী (রহঃ)-এর।

৪. নবুয়াতের ১২ম বছরের রমজান মাসে তথা হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে।

৫. নবুয়াতের ১৩ম বছরের মুহাররম মাসে তথা হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে।

৬. নবুয়াতের ১৩ম বছরের রবিউল আওয়াল মাসে তথা হিজরতের এক বছর পূর্বে।

এ ৬টি মতের মধ্যে প্রথম ৩টি অগ্রহণযোগ্য। কারণ, উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে, যে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর নামাজও মেরাজের রাত্রিতেই ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তাই যদি নবুয়াতের ১০ম সালের ২৭শে রজব বা তার পূর্বে মেরাজ সংঘটিত হত, তাহলে অবশ্যই খাদীজা (রাঃ) নামাজের ফরজ পেতেন। কারণ, তিনি আরো ৩মাস পরে রমজান মাসে মৃত্যবরণ করেন।

আর শেষের ৩টি মতের কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ারও কোন প্রমাণ মিলে না। কিন্তু সূরা বনি ইসরাঈলের বর্ণনাভঙ্গী থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ঘটনা হিজরতের প্রাক্কালে ঘটেছিল। [রাহীকুল মাখতুম দ্রঃ]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মেরাজ কখন সংঘটিত হয়েছে এর কোন সঠিক দলিল-প্রমাণ না কুরআনে আর না সহীহ হাদীসে

বা সীরাত গবেষকদের থেকে পাওয়া যায়। তাই কোন দিন নির্দিষ্ট করে অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা একটি বহুল প্রচলিত বিদাত।

মুহাদ্দিছীন তথা হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে তার বর্ণনা হলোঃ

ইব্‌নুল কাইয়িম(রহঃ)লিখেছেনঃ রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে সশরীরে বোরাকে তুলে জিবরীল (আঃ)-এর সঙ্গে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করানো হয়। এরপর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং সকল নবী-রসূলদের নিয়ে দুই রাকাত নফল সালাতের ইমামতী করেন। মসজিদের দরজার আংটার সাথে বোরাক বেঁধে রাখেন।

এরপর সেই রাত্রেই তাঁকে মাসজিদুল আকসা থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবরীল (আঃ) রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য দরজা খুলতে বললে তাঁর জন্য দরজা খোলা হয়। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেখানে মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)কে দেখেন এবং সালাম প্রদান করেন। আদম (আঃ) তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে সালামের জবাব দিয়ে তাঁর নবুয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর ডানে নেককারদের এবং বামে পাপিষ্ঠদের রূহসমূহ তাঁর হাবীবকে দেখালেন।

এরপর তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে জাকারিয়া (আঃ) এবং ঈসা ইবনে মার্‌ইয়াম (আঃ)কে দেখেন। তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ)কে দেখেন। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসমানে যথাক্রমে ইদ্রীস (আঃ), হারুন ইবনে ইমরান (আঃ) ও মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)কে দেখেন।

আর সপ্তম আসমানে তিনি ইব্‌রাহিম (আ:)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সিদ্‌রাতুল[১] মুন্তাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর কুলগুলো "হাজর"[২]-এর মটকার মত (বড়) এবং পাতাগুলো হাতীর কানের ন্যায়। এ বৃক্ষটিকে ঘিরে রেখেছে স্বর্ণের পতঙ্গ এবং নূর (আলো) ও বিভিন্ন প্রকারের রঙ।

অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে "বাইতুল মা'মূর" দেখানো হয়। এর ভিতরে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাঁরা একবার সালাত আদায় করবেন কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো দ্বিতীয়বার ফিরে আসার সুযোগ হবে না।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। তিনি সেখানকার রশিগুলো মুক্তার এবং মাটি কস্তুরীর (মেস্কের) মত দেখেন। তাঁকে আরো উপরে নেওয়া হলে সেখানে তিনি কলমের লিখুনীর শব্দ শুনেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার দুই ধনুকের ব্যবধান অথবা আরও কম নিকটে পৌঁছলেন। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অহি (ঐশী বাণী) পাঠালেন।

তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করলেন। মূসা (আ:)-এর পরামর্শে তিনি নামাজের ওয়াক্তের সংখ্যা কমানোর জন্য বারবার আল্লাহর নিকট গিয়ে শেষ পর্যন্ত দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ক'রে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: আমি আমার ফরজ কার্যকর করেছি এবং আমার বান্দার জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। গণনায় সালাত পাঁচ ওয়াক্ত কিন্তু সওয়াবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

---

[১]. "সিদ্‌রা" কুলবৃক্ষকে বলা হয়।

[২]. একটি শহরের নাম।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] মেরাজে তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন ও অন্যান্য অনেক কিছু দেখেছেন। মানসিক প্রশান্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সেই রাত্রিতেই তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। সকালে কা'বা শরীফের দিকে যান এবং লোকজনকে সে বিষয়ে খবর দেন। এতে করে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পথ কাফেরদের জন্য আরও সুগম হলো। তাদের কেউ তাঁকে মাসজিদুল আকসার বর্ণনা দিতে বলল। রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সাহায্যে একটা একটা ক'রে সঠিক বর্ণনা দিলেন।

এবার তারা বলল: অন্য কোন প্রমাণ চাই। তিনি মক্কা অভিমুখী কাফেলার বর্ণনা দিলেন। তিনি ঐ কাফেলাটির উটের সংখ্যা এবং তারা কখন মক্কায় এসে পৌঁছবে তাও বলে দিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] সবকিছুই ঠিক ঠিক বলে দিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কাফেররা ঈমান আনলো না। তারা তাদের হঠকারিতায় বলবৎ থাকল। মেরাজের সকালে জিব্‌রীল আমীন (আ:) এসে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রশিক্ষণ দিয়ে সময় ও পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। এর পূর্বে সকাল-সন্ধায় মাত্র দু'রাকাত ক'রে সালাত ছিল।

এদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আবু বক্‌র (রা:)কে "সিদ্দীক" মহাসত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন। কারণ মানুষ যখন ইসরা ও মেরাজের খবর অবিশ্বাস করেছিল তখন তিনি সবকিছুই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন।

৪. ইঙ্গিতে মেঘের আনুগত্য:

নবী [ﷺ]-এর জমানায় বৃষ্টি বন্ধ ও দুর্ভিক্ষ হয়। এমন সময় একদিন নবী [ﷺ] জুমার খুৎবা দিচ্ছিলেন। একজন লোক এসে সমস্যার কথা বললে তিনি দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এভাবে দীর্ঘ এক সপ্তাহ মুষলধারে বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি আবার দোয়া করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়। আনাস [رضي الله عنه] বলেন: নবী [ﷺ] আকাশের দিকে তাঁর অঙ্গুলি ইশারা করে যে দিকে মেঘকে যাওয়ার জন্য বলতে ছিলেন মেঘ সেদিকেই দ্রুত চলে যাচ্ছিল। [বুখারী ও মুসলিম]
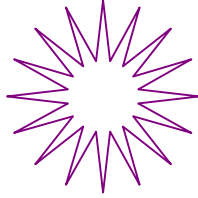
তৃতীয় প্রকারঃ

জীবজন্তুর ব্যাপারে তাঁর মু'জিযা

১. হিজরতের সময় মহানবী [ﷺ] উম্মে মা'বাদের জীর্ণ-শীর্ণ ছাগির শুকনা উলানে তাঁর মোবারক হাত বুলালে প্রচুর দুধ আসে। এরপর সকলে তৃপ্তিসহকারে সে দুধ পেট পুরে পান করেন। [তবরানী কাবীর ও দালাইলুন নবুওয়াহ-বাইহাকী]

২. মদীনার এক আনসারী পরিবার ছিল। তারা একটি উট দ্বারা পানি সেচের কাজ করত। উটটি হঠাৎ করে তাদের কোন কথাই শুনতে ছিল না। তারা নবী [ﷺ]কে অবহিত করালে তিনি যে বাগানে উটটি ছিল সেখানে যান। উটটি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে এবং তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। নবী [ﷺ] উটটিকে ধরে নাকে রশি পড়িয়ে কাজে লাগিয়ে দেন। [মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১২১৫৩]

চতুর্থ প্রকারঃ

রোগ আরগ্যের ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর মু'জিযাঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আতীক [رضي الله عنه]-এর ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসাঃ

আবু রাফে' সালাম ইবনে আবুল হাকীক ইহুদিদের একজন বড় নেতা ছিল। সে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে খুবই কষ্ট দিত এবং মক্কার কাফেরদেরকে নবী [ﷺ]কে হত্যার জন্য উৎসাহিত করত। সে খায়বারের অদূরে এক কেল্লায় বসবাস করত। নবী [ﷺ] তাকে হত্যার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে 'আতীক [رضي الله عنه]কে নির্দেশ করেন। তিনি সুন্দরভাবে ইহুদির অপারেশন শেষ করেন বটে কিন্তু পড়ে

গিয়ে তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। নবী [ﷺ] তাঁর ভাঙ্গা পায়ের উপর নিজ বরকতের হাত বুলিয়ে দিলে পা আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যায়। [বুখারী]

২. আলী ইবনে আবি তালিব [رضي الله عنه]-এর চোখের চিকিৎসা:

খায়বারের যুদ্ধের সময় আলী [رضي الله عنه]-এর চোখ ওঠে। নবী [ﷺ] তাঁর চোখে নিজের মুখের বরকতের থুথু দিয়ে দোয়া করলে সাথে সাথে চোখ ভাল হয়ে যায়। এমনকি চোখে কোন প্রকার ব্যথা বা রোগ যেন ছিল না। [মুসলিম]

পঞ্চম প্রকার:

গাছ ও পাথরের ব্যাপারে মু'জিযা:

১. খেজুর গাছের ডালের রোদন:

নবী [ﷺ] দাঁড়িয়ে জুমার খুৎবা দিতেন। মসজিদে একটি খেজুরের গাছের ডাল ছিল যার উপরে তিনি টেক দিতেন। একজন আনসারী মহিলা নবী [ﷺ]কে বলেন: আমার একজন কাঠমিস্ত্রি আছে। আমি তাকে আপনার জন্য একটি মেম্বার বানানোর জন্য নির্দেশ করি। নবী [ﷺ] অনুমতি দিলে তাঁর জন্য একটি মেম্বার বানিয়ে মসজিদে রাখা হয়। এরপর খুৎবা দেওয়ার জন্য নবী [ﷺ] মেম্বারে উঠে বসেন। বেলাল [رضي الله عنه] আজান শুরু করলে সাহাবাগণ কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। এরপর গরুর শব্দের মত শব্দ শুনতে পান।

জানতে পারা গেল যে, আওয়াজ হলো ঐ খেজুর গাছের ডালের। রসূলুল্লাহ [ﷺ] মেম্বার থেকে নেমে গিয়ে খেজুর ডালটিকে জড়িয়ে ধরলে কান্না বন্ধ করে। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন: ডালটি

জিকির হতে মাহরুম হওয়ার জন্য কাঁদতে ছিল। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে জড়িয়ে না ধরতাম, তাহলে সে কিয়ামত পর্যন্ত রোদন করতেই থাকত।" [মুসলিম ও আহমাদ]

২. দু'টি গাছ তাঁর আনুগত্য করল:

বিদায় হজ্বের সময় নবী [ﷺ] আফয়াহ নামক উপত্যকায় অবতরণ করেন। সেখানে প্রকৃতির চাহিদা পূরণের জন্য নবী [ﷺ] কোন আঁড়াল না পেলে দু'টি গাছের ডাল ধরে একত্রে মিলে যাওয়ার নির্দেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গাছ দু'টি তাঁর আনুগত্য করে। তিনি হাজাত পূরণ করে গাছ দু'টিকে আবার আপন স্থানে চলে যেতে বললে দ্রুত গাছ দু'টি যথাস্থানে তারা চলে যায়। [মুসলিম]

৩. নবী [ﷺ]-এর হাতের রোপণকৃত খেজুর গাছে ফল:

সালমান ফার্সী [رضي الله عنه]-এর ইসলাম কবুলের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। সালমান ফার্সী একজন ইহুদির দাস ছিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে কিছু দিরহাম ও খেজুর গাছ রোপণের বিনিমিয়ে ক্রয় করে নেন। শর্ত ছিল গাছ রোপণের পরে সালমান তাতে কাজ করে যেদিন খেজুর ধরবে সেদিন সে আজাদ হবে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি গাছ ছাড়া সবগুলো নিজ হাতে রোপণ করে দেন।

আর একটি লাগান উমার ফারুক [رضي الله عنه]। গাছগুলোতে সে বছরই খেজুর ধরে। কিন্তু উমার ফারুক [رضي الله عنه]-এর লাগানো গাছটি ব্যতিরেকে। নবী [ﷺ] বলেন: এ গাছটির ব্যাপার কি? উমার [رضي الله عنه] বলেন: এটি আমি রোপণ করেছিলাম হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]। আনাস [رضي الله عنه] বলেন: ঐ গাছটি উপড়ে দিয়ে সেখানে নবী [ﷺ] আবার অন্য একটি গাছ লাগিয়ে দেন এবং সে বছরই তাতে খেজুর আসে।

[আহমাদ:৭/৬৩১ হা: ২৩৩৮৫ মাওয়ারেদি বলেন: বর্ণনাকীরগণ বুখারী বা মুসলিমের বর্ণনাকারী, আ'লামুন নবুওয়াহ পৃ: ৩৩৭]

৪. নবী [ﷺ]কে পাথরের সালাম:

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "নবী হওয়ার পূর্বে মক্কার যে সমস্ত পাথর আমাকে সালাম দিত সেগুলো আমার চেনা-জানা। এ ছাড়া আজও সেগুলো আমার পরিচিত। [মুসলিম]

৫. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাতে কঙ্করের তসবিহ পাঠ:

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] বলেন: আমরা নবী [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় তিনি এক মুষ্টি কঙ্কর নিলেন। কঙ্করগুলো তাঁর হাতে তসবিহ পাঠ করা শুরু করে আর আমরা তা শুনি। অত:পর কঙ্করগুলো আবু বকর [رضي الله عنه]-এর হাতে তসবিহ পাঠ করে এবং আমাদের হাতেও তসবিহ পাঠ করে।
[আ'লামুন নবুওয়াহ: পৃ:১২৫-১২৬]

ষষ্ট প্রকার:

পানি ও খাদ্যে তাঁর মু'জিযা:

১. পানি বৃদ্ধি:

কোন এক সফরে প্রচণ্ড গরম ছিল। সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم] সবাই তৃষ্ণার্ত প্রচণ্ড তাঁদের পানির প্রয়োজন। কিন্তু কারো নিকট এক ফোটাও পানি ছিল না। নবী [ﷺ] আলী (রা:) ও অন্য একজনকে ডেকে বললেন: যাও দু'জনে পানি তালাশ কর। তাঁরা দু'জনে তালাশ করে একজন অমুসলিম মহিলা থেকে কিছু পানি সংগ্রহ করে আনেন। নবী [ﷺ] দোয়া করলে ঐ অল্প পানি দ্বারা সকলের

প্রয়োজন মিটে যায়। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ঐ অমুসলিম মহিলাটিকে কিছু দেওয়ার জন্য বললে সাহাবাগণ তার জন্য যথা সম্ভব জমা করে তাকে অর্পণ করেন। মহিলাটি ফিরে গিয়ে ঘটনা সবার কাছে বর্ণনা করলে সে এবং তার জাতির সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

২. আবু কাতাদা [رضي الله عنه]-এর ছোট মশক হতে পানির ফোয়ারাঃ

নবী [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে সঙ্গে নিয়ে কোন এক সফরে যাচ্ছিলেন। সাথে পানি ছিল অপ্রতুল্ল। নবী [ﷺ] ভাষণ দিয়ে বলেনঃ তোমরা দিন-রাত চলে আগামি কাল পানি পাবে। পথ ছিল অনেক লম্বা সকলে চলতে থাকলেন। সবাই বড় পিপাসার্ত এবং ওযু করার পানিও নেই কারো নিকটে। নবী [ﷺ] আবু কাতাদা [رضي الله عنه]কে তার মশক হাজির করার জন্য নির্দেশ করলে তিনি তা হাজির করলেন। তার মধ্যে কিছু পানি ছিল, সে পানি থেকে নবী [ﷺ] হালকা করে ওযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি হেফাজত করে রাখার জন্য আবু কাতাদাকে আদেশ করলেন। আর বললেন, এর একটা আশ্চর্য জনক সংবাদ হবে। সকলে রাস্তা চলতে থাকলেন। দিন হলো এবং প্রচুর গরমে সবকিছু উত্তপ্ত হয়ে পড়ল। সকলে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম, আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। তিনি [ﷺ] বললেনঃ না তোমরা ধ্বংস হবে না।

এরপর বললেনঃ আমার ওযুর পাত্রটি হাজির কর। অত:পর আবু কাতাদা [رضي الله عنه]-এর মশকটি নিয়ে আসতে বললেন। মশকটি উপস্থিত করা হলো তার মধ্যে অল্প কিছু পানি ছিল। নবী [ﷺ] মশকটি নিয়ে তার বাঁধন খুলে উলটিয়ে ধরলে পানির ফোয়ারা ছুটতে লাগল এবং সকলে ভিড় জমাল। নবী [ﷺ] বললেনঃ তোমরা

ভিড় কর না সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। এরপর নবী [ﷺ] পাত্রে পানি ঢালতে থাকলেন এবং আবু কাতাদা সকলকে পান করাতে লাগলেন। বাকি থাকল শুধুমাত্র আবু কাতাদা ও নবী [ﷺ]।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] পানি ঢেলে আবু কাতাদাকে পান করতে বললেন। তিনি বললেন: যতক্ষণ আপনি না পান করবেন ততক্ষণ আমি পান করব না, হে আল্লাহর রসূল। তিনি [ﷺ] বললেন: জাতির পানি পরিবেশনকারী সবার শেষে পান করে। অত:পর আবু কাতাদা [رضي الله عنه] ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং সমস্ত মানুষ তৃপ্তি সহকারে পান করেন। সেদিন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিন শত (৩০০) জন। ইহা ছিল নবী [ﷺ]-এর বরকত ও একটি বিশেষ মু'জিযা। [মুসলিম ও আহমাদ]

৩. তাবুকের ঝর্নার পানি বৃদ্ধি:

তাবুকের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কঠিন ও আশ্চর্যজনক যুদ্ধ। মুসলিম সৈন্যরা ক্ষুধা, পিপাসা ও প্রচণ্ড কষ্টের শিকার হন। রাস্তা ছিল দীর্ঘ ও সংখ্যাও ছিল অনেক। নবী [ﷺ] জোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে জমা করে আদায় করেন।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে বলেন: আল্লাহ চাহে আগামি কাল তোমরা তাবুকের ঝর্নার নিকট পৌঁছবে। সেখানে তোমরা চাশতের সময় গিয়ে উপস্থিত হবে। তোমাদের যে কেউ সেখানে গিয়ে পৌঁছবে সে যেন আমি আসার পূর্বে ঝর্নার পানি স্পর্শ না করে। এদিকে নবী [ﷺ] পৌঁছার আগেই দু'জন মানুষ ঝর্নার নিকট পৌঁছে যায়। ঝর্নার পানি ছিল অতি অল্প। দু'জন মানুষকে দেখে নবী [ﷺ] জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি ঝর্নার পানি স্পর্শ করেছ? তারা বলল: হ্যাঁ, শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] রাগান্বিত

হলেন এবং বললেন: নিষেধ করার পরেও কিভাবে পানি স্পর্শ করলে তোমরা?

এদিকে সাহাবাগণ ভীষণ তৃষ্ণার্ত। নবী [ﷺ] কিছু সাহাবাকে পানি আনতে বললে তাঁরা ঝর্না থেকে মুষ্টিভরে উঠিয়ে একটি পাত্রে কিছু পানি হাজির করলেন। নবী [ﷺ] ঐ পাত্রে নিজের বরকতময় মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করে ঝর্নায় ঢেলে দিলেন। এই বরকতপূর্ণ পানি ঝর্নার পানিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্না প্রবাহিত হল এবং প্রচুর পানি বইতে শুরু করল। সকলে তৃপ্তি সহকারে পানি পান ও ওযু করল। এরপর নবী [ﷺ] মু'আয [رضي الله عنه]-এর দিকে চেয়ে বললেন: তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে দেখবে এখানে একদিন ক্ষেত-খামার ও বাগান দ্বারা ভরে যাবে। [মুসলিম]

৪. খাদ্য বৃদ্ধির মু'জিযা:

জাবের [رضي الله عنه] বলেন: আমরা খন্দকের দিন পরিখা খননের কাজ করি। একটি শক্ত পাথর দেখা দিলে আমরা নবী [ﷺ]কে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! একটি শক্ত পাথর যা আমরা কাটতে পারছি না। তিনি বললেন: গর্তে আমি নামতেছি। তিনি দাঁড়ালেন এ সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। এদিকে আমরা তিন দিন যাবৎ অনাহারে ছিলাম। নবী [ﷺ] কোদাল নিয়ে শক্তভাবে আঘাত করলে পাথরটি গড়িয়ে পড়া বালুর ন্যায় হয়ে গেল।

জাবের [رضي الله عنه] বলেন: আমি বললাম:হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটু বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিন। ---- বাড়ীতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এমন অবস্থায় দেখেছি যা ধৈর্য ধরার মত নয়। স্ত্রী বলল: আমার নিকট কিছু যব ও একটি ছাগলের বাচ্চা আছে। আমি ছাগলের বাচ্চাটি জবাই করলাম এবং সে (স্ত্রী) যবগুলো পিষে আটা বানালো। গোশত চুলাতে উঠিয়ে

দিয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট চলতে লাগলে আমার স্ত্রী বলল: খবরদার! রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন তাদের কাছে আমাকে অপদস্ত করবে না।

জাবের [رضي الله عنه] বলেন: আমি চুপে চুপে নবী [ﷺ]কে বললাম: আমার অল্প কিছু খানা রয়েছে আপনি এবং এক দু'জন চলেন। তিনি [ﷺ] বললেন: কতটুকু খাদ্য? আমি উল্লেখ করলাম। তিনি [ﷺ] বললেন এতো অনেক। অত:পর তিনি [ﷺ] জোর গলায় বললেন: হে খন্দকবাসীরা! জাবের তোমাদের জন্য খানা পাকিয়েছে, চল সবাই যায়। এরপর বললেন: তোমার স্ত্রীকে বল: আমি না আসা পর্যন্ত সে যেন চুলা বন্ধ না করে এবং রুটির তন্দুর না জ্বালায়। মুহাজের ও আনসার এবং যারা তাঁদের সঙ্গে ছিল সকলে চললেন।

ঐদিকে জাবেরের স্ত্রী তাকে বলল: এখন কি হবে? তোমাকে বলি নাই? জাবের [رضي الله عنه] বলেন: তুমি যা করতে বলেছিলে তাই করেছি। এরপর নবী [ﷺ]-এর জন্য আটার খামির হাজির করলে তিনি তাতে তাঁর বরকতের থুথু দিয়ে বরকতের দোয়া করেন। অত:পর চুলার পাশে গিয়ে তাতেও থুথু দিয়ে বরকতের দোয়া করেন।

এরপর তিনি বললেন: রুটি পাকওয়ানীকে ডাক সে যেন আমার সঙ্গে রুটি বানায়। আর চুলার উপরের পাতিল থেকে পিয়ালায় গোশত দাও। আর সাবধান! পাতিল চুলা থেকে নামাবে না। সেদিন সাহাবাদের সংখ্যা ছিল ১০০০ (এক হাজার)। জাবের [رضي الله عنه] আল্লাহর কসম করে বলেন: তাঁরা সকলে পেট পুরে খেয়ে ফিরেন। কিন্তু চুলার গোশত আর আটার খামির যেমন ছিল তেমনিই রয়ে যায় একটুকুও কমেনি। [বুখারী]

৫. দুধ বৃদ্ধির ঘটনাঃ

আবু হুরাইরা [ﷺ] বলেনঃ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি ভীষণ ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আর ক্ষুধার জন্য আমার পেটের উপরে পাথর বাঁধি। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ চলাচলের রাস্তায় বসে থাকি। পথ দিয়ে আবু বকর (রা:) অতিক্রম করলে তাঁকে একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করি, যাতে করে তিনি আমার খবরাদি নেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। অত:পর উমার (রা:) পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তাঁকেও একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করি, যেন তিনি আমার খবর নেন। কিন্তু তিনিও কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে যান।

এরপর নবী [ﷺ] অতিক্রম করেন। তিনি আমাকে দেখেই মৃদু (মুচকি) হাসেন এবং আমার অবস্থা উপলদ্ধি করতে পারেন। তিনি বললেনঃ আবু হির (হুরাইরার সংক্ষেপ) আমি বললামঃ লব্বাইকা (হাজির) হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]। তিনি বললেনঃ আমার সঙ্গে চল। আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি [ﷺ] বাড়িতে প্রবেশ করে আমার জন্য অনুমতি নিয়ে আমাকে প্রবেশ করতে বললে আমি প্রবেশ করি।

ওদিকে নবী [ﷺ] বাড়িতে একটি পিয়ালায় কিছু দুধ দেখে বললেনঃ কোথা থেকে এ দুধ এসেছে? বাড়ির লোকেরা বললেনঃ অমুক মহিলা বা পুরুষ আপনার জন্য হাদিয়া দিয়েছে। তিনি [ﷺ] বললেনঃ আবু হির! বললামঃ লাব্বাইকা ইয়াা রাসূলাল্ল্যাহ। তিনি বললেনঃ যাও আহলুস্ সুফফার সকলকে ডেকে নিয়ে আস। আবু হুরাইরা বলেনঃ আহলুস সুফ্ফার লোকেরা ইসলামের মেহমান। তাঁদের না কোন পরিবার ছিল আর না ছিল কোন সম্পদ। নবী

[ﷺ]-এর নিকট দান-খয়রাত আসলে নিজে না নিয়ে তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আর হাদিয়া আসলে নিজে খেতেন এবং তাঁদেরকেও শরিক করতেন।

আহলুস্ সুফফাকে ডাকতে বলায় আমার খারাপ লাড়ে। কারণ, তাঁদের সংখ্যার কাছে এই অল্প দুধ কি হবে!? আর আমিই তো এ দুধ পানের বেশি হকদার, যা দ্বারা আমি নিজে শক্তি সঞ্চার করব। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা আসলে নবী [ﷺ] আমাকে সবাইকে দুধ পান করানোর জন্য নির্দেশ করেন। আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম আমার নসিবে কিছু পৌঁছবে কি না?!

আমি তাঁদেরকে দুধ পান করাতে আরম্ভ করলাম। তাঁরা একে একে সকলে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করেন। শেষ পর্যন্ত পিয়ালা নবী [ﷺ]-এর নিকট পৌঁছে। তিনি দুধের পিয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আমার দিকে দেখে মুচকি হাসি দিলেন। অত:পর বললেন: আবু হির! বল্লাম: লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন: আমি আর তুমি বাকি আছি। আমি বললাম: ঠিক বলেছেন হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: বসে এবার তুমি তৃপ্তি সহকারে দুধ পান কর। আমি বসে তৃপ্তিসহকারে পান করলাম। এরপর পিয়ালাটি তাঁকে দিলাম এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। [বুখারী]

সপ্তম প্রকারঃ

নবীর জন্য আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতাঃ

১. ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যঃ

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস [ﷺ] বলেনঃ ওহুদের যুদ্ধে আমি নবী [ﷺ]-এর ডান ও বাম পাশে দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি দেখি। নবী [ﷺ]-এর পক্ষ থেকে তারা দু'জন তুমুল যুদ্ধ করেন। তাদেরকে এ দিনের আগে-পরে আর কখনো দেখিনি। তাঁরা দু'জন ছিলেনঃ জিবরাঈল (আ:) ও মিকাঈল (আ:) ফেরেশতা। [বুখারী ও মুসলিম]

২. "আমি আপনাকে বিদ্রুপকারীদের থেকে রক্ষা করেছি":

মক্কার কিছু কাফের নবী [ﷺ]কে বেশি বেশি কষ্ট দিত। তাঁকে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। তারা হচ্ছেঃ ওলিদ ইবনে মুগীরা, আসওয়াদ ইবনে আব্দ ইয়াগুছ, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, হারেস ইবনে 'আয়তাল ও আস ইবনে ওয়ায়েল আসসাহমী। একদিন জিবরাঈল (আ:) আসলে নবী [ﷺ]-তাঁর নিকট অভিযোগ করেন। অত:পর ওলিদ অতিক্রম করলে জিবরাঈল (আ:) তার অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেনঃ আমি আপনাকে তার থেকে প্রতিরক্ষা করলাম।

এরপর আসওয়াদ ইবনে আব্দ ইয়াগুসকে দেখিয়ে দিলে তার মাথার প্রতি ইঙ্গিত করে জিবরাঈল (আ:) বলেনঃ আমি আপনাকে তার থেকে প্রতিরক্ষা করলাম। এরপর হারেস ইবনে 'আয়তালকে দেখিয়ে দিলে জিবরাঈল (আ:) তার পেটের প্রতি ইশারা করে বলেনঃ আমি আপনাকে তার থেকে প্রতিরক্ষা করলাম। অত:পর আস ইবনে ওয়ায়েলকে দেখিয়ে দিলে জিবরাঈল (আ:) তার

পায়ের নিচের দিকে ইশারা করে বলেন: আমি আপনাকে তার থেকে প্রতিরক্ষা করলাম। অল্প কিছু দিন অতিক্রম করতে না করতে জিবরাঈল (আ:)-এর খবর মত তাদের প্রতি শাস্তি নাজিল হয়।

ওলিদ রাস্তা দিয়ে চলতে ছিল। খুজা'আ গোত্রের একজন মানুষের পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল। ঐ ব্যক্তি বসে বসে তীর ঠিক করতে ছিল। লোকটি ওলিদের হাতের আঙ্গুলে আঘাত করে কেটে ফেলে। আর মাত্র কিছু দিন পরে সে মারা যায়।

আর আসওয়াদ ইবনে আব্দ ইয়াগুসের মাথায় ফোঁড়া ও ঘা হয় এবং তাতে সে মারা যায়। আর আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব তার সন্তানদের নিয়ে একটি গাছের নিচে অবতরণ করে। হঠাৎ করে বলে উঠে: ও বাচ্চারা আমাকে বাঁচাও! আমাকে কে যেন হত্যা করছে! সন্তানরা বলল: কই কাউকে তো দেখতেছি না। সে বলল: আমার চোখে কে যেন কাটা দ্বারা আঘাত করতেছে। শেষ পর্যন্ত তার দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যে সেও মারা যায়।

আর হারেস ইবনে 'আয়তালের পেটে হলুদ পানি ধরে এবং বিরাট আকারে ফুলে উঠে। এমনকি তার মুখ দিয়ে পায়খানা বের হয় এবং মারা যায়।

আর আস ইবনে ওয়ায়েল তার গাধার পিঠে আরোহণ করে তায়েফ অভিমুখে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত গাছের সাথে তার গাধাটি বাঁধার সময় তার পায়ের নিচে কাঁটা বিধে এবং তাতেই সে মারা যায়। [বাইহাকী]

আর সত্যিই আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:"আমি আপনাকে বিদ্রুপকারীদের থেকে রক্ষা করেছি।" [সূরা হিজর:৯৫]

৩. খন্দকের যুদ্ধে প্রচণ্ড বাতাস ও সৈন্য দ্বারা সাহায্যঃ

মদিনার উপর হামলা করার জন্য কাফেররা একত্রিত হয়। নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাগণ তাঁদের যধাসাধ্য প্রতিরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্রচণ্ড বাতাস ও বিশেষ অজানা সৈন্য প্রেরণ করেন। বাতাস দ্বারা আল্লাহ তাদের আগুন নিভিয়ে দেন এবং হাঁড়ি-পাতিলগুলো উলটিয়ে দেন ও তাঁবুগুলো উপড়ে দেন। এ ছাড়া ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলেন ও ঘোড়াগুলো ভাগিয়ে দেন এবং উটগুলো ছত্রভঙ্গ করে দেন। আর আল্লাহ এমন সৈন্য পাঠান যা চোখ দ্বারা দেখা যায়নি। তারা তাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা বিতাড়িত করে। যার ফলে তারা বাধ্য হয়ে যার যার ঘরে ফিরে যায়। [সূরা আহজাবঃ৯]

৪. বৃষ্টি দ্বারা সাহায্যঃ

বদরের যুদ্ধে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে। নিদর্শন প্রকাশ পায় ও কারামাত জাহের হয়। ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে এবং মুসলমানদের অন্তরকে সুদৃঢ় করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ও সরঞ্জামাদি ছিল অল্প। প্রতিপক্ষের সংখ্যা ছিল বেশি ও যুদ্ধের হাতিয়ার ছিল ভারী। বদরের প্রান্তে মুশরিকরা শক্ত স্থানে অবতরণ করে আর মুসলমনরা করেন বালুর স্তুপে, যার উপর দৃঢ়পদে দাঁড়ানো ছিল বড় কঠিন। আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে মুসলমানরা যে দিকে অবস্থান নিয়ে ছিলেন শক্ত ক'রে তাদের পা-কে দৃঢ় করে দেন। আর কাফেরদের স্থানকে পিচ্ছল করে দিয়ে তাদের বিপদ বাড়িয়ে দেন।

মুসলিম সৈন্যরা পানি পান, গোসল এবং পবিত্রা অর্জন করেন। এ বৃষ্টি বর্ষণ ছিল মুমিনদের জন্য রহমত এবং কাফেরদের জন্য ছিল জহমত। মুসলমানদের পা দৃঢ় হয় আর কাফেরদের পা

পিছলে যায়। এ ঘটনার কথা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে করে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা-গুলো।" [সূরা আনফাল:১১]

অষ্টম প্রকার:

আল্লাহ তাঁর নবীকে হেফাজত করেন:

১. এ উম্মতের ফেরাউন থেকে হেফাজত:

আবু জাহল এ উম্মতের ফেরাউন বড় অহংকারী ও দাম্ভিক ছিল। সে এক দিন কা'বার পার্শ্বে তার সঙ্গী-সাথীদের নিকট এসে বলল: মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে আজ তার মুখমণ্ডল মাটিতে লাগিয়েছে (সেজদা করেছে)? তারা বলল: হ্যাঁ, শুনে সে প্রচণ্ড রেগে উঠল এবং লাত ও উজ্জা মূর্তির কসম করে বলল: যদি মুহাম্মদকে আবার সেজদা করতে দেখি, তাহলে তার গর্দান মাটিতে পদদলন করে দেব।

এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে নবী [ﷺ] কা'বার পাশে এসে তকবির দিয়ে নামাজ আরম্ভ করেন। তিনি সেজদায় তাঁর প্রতিপালকের সঙ্গে মুনাজাত করছেন, এমন সময় আবু জাহ্ল গোস্সায় জ্বলে উঠে এবং নবী [ﷺ]-এর গর্দান পা দ্বারা দলন

করার জন্য অহঙ্কারের সাথে নবী [ﷺ]-এর দিকে এগিয়ে চলে। সে নবী [ﷺ]-এর কাছে না পৌঁছতেই চিৎকার করতে শুরু করে এবং পিছনের দিকে চলতে থাকে। আর তার হাত দ্বারা সামনের দিক থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। যেন কোন আগুন বা অনিষ্ট তার চেহারার উপর আক্রমণ করছে। তার সাথীরা তার দিকে দেখে বলে উঠে: কি হলো তোমার?

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: আমার ও মুহাম্মদ [ﷺ]-এর মাঝে একটি আগুনের গর্ত ও ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং পাখা বিশিষ্ট (ফেরেশতা) কি যেন! নবী [ﷺ] নামাজ শেষে বললেন: সে যদি আমার নিকটে আসত, তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয় আল্লাহর বাণী:

"আপনি কি দেখেছেন, যে নিষেধ করে, এক বান্দাকে যখন সে নামাজ আদায় করে? আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে, আথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়। আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াই-মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। এতএব, সে তার সভাসদকে আহ্বান করুক। আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে, কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।" [সূরা আলাক:১০-১৯] [বুখারী ও মুসলিম]

২. সুরাকা ইবনে মালেক থেকে হেফাজত:

নবী [ﷺ]-এর হিজরতের সময় কুরাইশরা ঘোষণা করে, যে মুহাম্মদ বা তার সঙ্গী আবু বকরকে ধরে দিতে পারবে তাকে ১০০

উট পুরস্কার দেয়া হবে। সকলে এত বড় অংকের পুরস্কার হাসিলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে একজন ছিল সুরাকা ইবনে মালেক। সে নবী [ﷺ]-এর সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলে আবু বকর [ﷺ] বলেন: হে আল্লাহর নবী সুরাকা তো আমাদেরকে গ্রেফতার করে ফেলবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: চিন্তা করো না। এরপর তিনি [ﷺ] সুরাকার উপর বদদোয়া করলে তার ঘোড়ার পা শক্ত মাটিতে পেট পর্যন্ত পুঁতে যায়। সুরাকার অনেক চেষ্টা বিফলে যায়। সে চিৎকার করে বলে: আমি জানি আপনারা দু'জনে আমার প্রতি বদদোয়া করেছেন। আমার জন্য দোয়া করুন আমি আপনাদের তালাশকারীদের সকলকে ফিরিয়ে দেব।

নবী [ﷺ] তার নিস্কৃতির জন্য দোয়া করলে সে ও তার ঘোড়া নাজাত পায়। সুরাকা মক্কার পানে ফিরে যায় এবং কুরাইশদের যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই বলে: না, ওদিক দেখে এসেছি তোমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর সে মানুষকে অন্যান্য দিকে তালাশ করার জন্য উৎসাহিত করে। আল্লাহ তাঁর নবীকে নাজাত দিলেন। আর সত্যিই তিনি বলেছেন:

"মানুষ থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন"

[সূরা মায়েদা:৬৭] [বুখারী ও মুসলিম]

৩. একজন মুশরিকের তরবারি থেকে রক্ষা:

কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে নবী [ﷺ] ও সাহাবাগণ একটি উপত্যকায় অবতরণ করেন। সাহাবাগণ ছায়ার জন্য বিভিন্ন গাছের নিচে অবস্থান নেন। নবী [ﷺ]ও একটি গাছের ডালে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে তার নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। ঐদিকে এক মুশরেক রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর

মাথার পাশে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে তরবারিটি নিজ হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করে।

এরপর নবী [ﷺ]-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে জয়ের নেশায় চিল্লাচিল্লি করে বলতে থাকে: হে মুহাম্মাদ! এখন আমার থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? নবী [ﷺ] তাঁর দুই চক্ষু খুলে দেখেন মানুষটি খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে সাহাবাগণ তাঁর থেকে দূরে যত্র-তত্র রয়েছে। নবী [ﷺ] বললেন: তোমার থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন। সাথে সাথে লোকটি সরে গেল এবং তার হাত থেকে তরবারিটি মাটিতে পড়ে গেল। অত:পর নবী [ﷺ] দাঁড়ালেন এবং তরবারিটি হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন: এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? লোকটি কোন উপায় না পেয়ে বলল: কেউ নেই, তবে আশা করি আপনি উত্তম তরবারি ধারণকারী হবেন।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] লোকটিকে বললেন: ইসলাম কবুল কর? বলল: না, কিন্তু অঙ্গিকার করছি আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করব না। আর যে জাতি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে তাদের সঙ্গে সাথ দেব না। নবী [ﷺ] তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকটি তার জাতির রাজা ছিল। সে তার জাতির কাছে চলে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম কবুল করে। [বুখারী ও মুসলিম]

৪. জমিনও রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সাহায্য করল:

নবী [ﷺ]-এর যুগে একজন মানুষ খ্রীষ্টান ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সূরা বাকারা ও আল ইমরাম পাঠ করে। সে লেখক ও পাঠক ছিল। এমনকি নবী [ﷺ]-এর অহি লেখকদের একজন ছিল। হঠাৎ করে একদিন সে আবার খ্রীষ্টান হয়ে যায় এবং আহলে কিতাবের সাথে গিয়ে মিলে। লোকটি নবী [ﷺ]-এর

দুর্নাম করত এবং কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করত। আর বলত: আমি যা তার জন্যে লিখেছি তা ব্যতীত মুহাম্মদ আর কিছুই জানে না।

এ দেখে নবী [ﷺ] তার উপর বদদোয়া করেন। দোয়াতে তিনি বলেন: হে আল্লাহ! তার ব্যাপারে একটি নিদর্শন দেখাও। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতে আল্লাহ তা'য়ালা লোকটিকে মেরে ফেলেন। তার সঙ্গী-সাথীরা নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করে দেয়।

এদিকে সকালে তারা দেখল মাটি তাকে উপরে নিক্ষেপ করেছে। তারা বলল: নিশ্চয় ইহা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা করেছে। সে মুরতাদ হওয়ার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর খুঁড়ে বের করে ফেলেছে। তারা আবার সম্ভবপর গভীর করে কবর খনন করে দাফন করে দেয়। এরপর যখন তারা প্রভাত করল দেখল: আবার মাটি তাকে উপরে নিক্ষেপ করে রেখেছে। তার সঙ্গীরা আবার মুহাম্মদ [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাগণকেই অপবাদ দিল।

অত:পর আবারও আগের চেয়ে বেশি গভীর কবর খনন করে তাকে দাফন করল। কিন্তু আবারও পূর্বের ন্যায় অবস্থা। এবার তারা বুঝতে পারল যে, ইহা মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে মাটির উপর নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দিল। সে মাটির উপরে পড়ে থাকল এবং কুকুর তার উপর পেশাব করল, নেকড়ে বাঘ তার শরীরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল এবং পাখীরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে টুকরা টুকরা করে ফেলল। [বুখারী ও মসলিম]

৫. বনি নজীরের হত্যাচক্র থেকে নবী [ﷺ]কে আল্লাহ বাঁচালেন:

মদীনায় ইহুদিদের ৩টি গোত্র বসবাস করত। বনি কুরাইযা, বনি নাজীর ও বনি কায়নুকা'। নবী [ﷺ] ও এদের মাঝে চুক্তি ছিল হত্যা ও অন্যান্যর দিয়তে (পণ) সাহায্য করবে। বনি আমের ও

নবী [ﷺ]-এর মাঝে চুক্তি ছিল। এদিকে আমর ইবনে উমায়্যা [رضي الله عنه] তাদের দু'জন মানুষকে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলেন। তাই নবী [ﷺ] কিছু সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনি নাজীরের নিকট দিয়তের সাহায্যের জন্য যান।

তারা রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তাঁর সঙ্গীদেরকে একটি দেওয়ালের পাশে বসিয়ে রেখে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে চলে যায়। এদিকে নবী [ﷺ] ভাবেন তারা হয়তো দিয়তের সম্পদ জমা করার জন্য একত্রে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু তারা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আজ মুহাম্মদকে হত্যা করার এক মহা সুযোগ। ছাদের উপর উঠে বড় একটি পাথর ফেলে হত্যা করার জন্য তারা আমর ইবনে জাহ্হাশকে ঠিক করে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] যে দেওয়ালের পাশে বসে ছিলেন সে ছাদে ইবনু জাহ্হাশ পাথর ফেলে মারার জন্য উঠলে আসমান থেকে খবর চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে নবী [ﷺ] সাহাবাদেরকে রেখেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে মদিনায় প্রস্থান করেন। ইহুদিরা অপেক্ষা করে এবং সাহাবীগণও অপেক্ষা করেন। সাহাবাগণ পরে জানতে পারেন যে, তিনি [ﷺ] মদিনায় চলে গেছেন। এরপর তাঁরাও মদিনায় গিয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট থেকে ঘটনা অবহিত হলেন। অতঃপর নবী [ﷺ] বনি নাজীরকে অবরোধ করে রাখেন এবং অবশেষে মদীনা থেকে বহিস্কার করে দেন।

[দালাইলুন নুবুওয়াহ-বাইহাকী:২/৪২৮]

নবম প্রকারঃ

নবী [ﷺ]-এর দোয়া কবুলের মু'জেযাঃ

১. আবু হুরাইরা [ﷺ]-এর মার হেদায়েতের জন্য দোয়াঃ

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه]-এর মা আপন ধর্মের উপরেই বাকি থেকে মূর্তিপূজা করত। এদিকে আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু মা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। একদিন মাকে ইসলামের দা'ওয়াত করলে আবু হুরাইরার মা রসূলুল্লাহ [ﷺ] সম্পর্কে এমন কথা শুনাই যা আবু হুরাইরা ঘৃণা করেন।

তাই আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] কাঁদতে কাঁদতে নবী [ﷺ] -এর নিকট হাজির হয়ে বলেনঃ ইয়াা রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেই কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। আর আজ দা'ওয়াত করলে আপনার ব্যাপারে যা অপছন্দ করি তাই আমাকে শুনিয়েছেন। আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহর নবী [ﷺ] বলেনঃ হে আল্লাহ! আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান করুন।

আবু হুরাইরা নবী [ﷺ]-এর দোয়া শুনে আনন্দে বাড়ির দিকে ছুটে যায়। পৌঁছে দরজার কড়া নড়ালে তার মা বলেনঃ আবু হুরাইরা নিজের স্থানে দাঁড়াও! আবু হুরাইরা পানির শব্দ শুনতে পান। এদিকে তার মা গোসল করতেছিল। দরজার নিকট একটু অপেক্ষা করেন আর তার মা গোসল করে কাপড় পরে দরজা খুলে বলেনঃ হে আবু হুরাইরা! আশহাদু অল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রসূলুল্লাাহ্। আবু হুরাইরা আনন্দে আবার

কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে সুসংবাদ জানিয়ে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন, আবু হুরাইরার মা হেদায়েত গ্রহণ করেছেন।

শুনে নবী [ﷺ] ও খুশি হন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে আবু হুরাইরার জন্য কল্যাণের কথা বলেন। কল্যাণের কথা শুনে আবু হুরাইরা লোভ করে নবী [ﷺ]কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন! তিনি যেন আমাকে ও আমার মাকে তাঁর মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করে দেন। আর তাঁরাও যেন আমাদের নিকট প্রিয় হয়।

আল্লাহর নবী দোয়া করেন: হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা-আবু হুরাইরা ও তার মাকে তোমার মুমিন বান্দাদের নিকট প্রিয় করে দিন। আর মুমিন বান্দাদেরকেও তাদের নিকট প্রিয় করে দিন।

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] বলেন: প্রতিটি মুমিন যে আমার কথা শুনতেন এবং আমাকে দেখতেন সেই আমাকে ভালবাসতেন। [বাইহাকী ও আহমাদ-সনদ সহীহ]

২. আবু তালহা ও তার স্ত্রীর জন্য দোয়া কবুল:

উম্মে সুলাইম (রা:) আবু তালহা [رضي الله عنه]কে বিবাহ করেন। তাদের ঘরে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখেন আবু 'উমাইর। আবু তালহা ছেলেটিকে প্রচণ্ড ভলবাসতেন। বরং নবী [ﷺ] ও ছেলেটিকে পরম ভালবাসতেন। ছেলেটি একটি পাখীর বাচ্চা নিয়ে খেলা-ধুলা করত, যার নাম ছিল নুগাইর। নবী [ﷺ] তাকে রসিকতা করে বলতেন: হে আবু 'উমাইর নুগাইরের অবস্থা কী?

ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে আবু তালহা [رضي الله عنه] খুবই চিন্তিতি হন। একদিন বাচ্চাটির রোগ বেড়ে যায়। অন্য দিকে আবু তালহা

[ﷺ] কোন প্রয়োজনে রাতে নবী [ﷺ]-এর নিকটে দেরী করেন। এদিকে বাচ্চাটি তার মার কাছে মারা যায়। পরিবারের কেউ কেউ কান্না-কাটি করলে উম্মে সুলাইম তাদেরকে শান্তনা দেন। আর বলেন: তোমরা কেউ আবু তালহাকে বাচ্চার মৃত্যুর সংবাদ দিবে না। ছেলেটিকে বাড়ির কোন এক কোনে চাদর দ্বারা ঢাকা দিয়ে রাখলেন। স্বামীর জন্য খানাপিনা প্রস্তুত করলেন এবং ঘরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: বাচ্চাটি এখন প্রশান্তিতে আছে এবং আশা করি আরাম পেয়েছে। দেখতে চাইলে উম্মে সুলাইম নিষেধ করে বললেন: সে চুপচাপ আছে তাকে এখন নড়াবে না।

এরপর খানাপিনা উপস্থি করলেন এবং আবু তালহা রাত্রির পানাহার করলেন। অত:পর উম্মে সুলাইম স্বামীকে পরম আনন্দ দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কাজটি করলেন। যখন দেখলেন স্বামী পরিতৃপ্তি এবং শান্ত হয়েছে তখন বললেন: আচ্ছা আবু তালহা! যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু ধার দিয়ে ফেরৎ চায়, তাহলে কি তা বাধা দেওয়া তাদের ঠিক হবে?

আবু তালহা [ﷺ] বলেন: না, উম্মে সুলাইম বলেন: আচ্ছা আমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে আশ্চর্য হবে না? আবু তালহা [ﷺ] বললেন: কেন? উম্মে সুলাইম বললেন: তাদেরকে কোন ব্যক্তি ধার দিয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের নিকটে রেখেছে। এমন কি তারা মনে করছে ওরা ওটার মালিক হয়ে গেছে। অত:পর যখন আসল মালিক তা তাদের নিকট থেকে চাইছে তখন তারা দিতে ঘাবড়ে পড়তেছে।

আবু তালহা [ﷺ] বললেন: তাদের কাজটি বড়ই খারাপ। এবার স্ত্রী বললেন: তোমার ছেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ধার

জিনিস ছিল আর আল্লাহ তাকে নিয়ে নিয়েছেন। অতএব, তোমার সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সওয়াব কামনা কর।

আবু তালহা [ﷺ] এ কথা শুনা মাত্রই ধৈর্যহারা হয়ে বললেন: আল্লাহর কসম! রাত্রের ঘটনায় আমাকে তুমি ধৈর্যের কথা বলছ। তিনি ছেলেটিকে কাফন-দাফন করলেন। সকালে নবী [ﷺ]-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে নবী [ﷺ] তাদের জন্য বরকতের দোয়া করেন। ঐ রাত্রির মিলনে তাদের ঘরে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তার নাম রাখেন: আব্দুল্লাহ, যার ঔরষে জন্মগ্রহণ করে ৯জন সন্তান। তারা সকলেই কুরআনের হাফেজ ছিলেন। [বাইহাকী ও আহমাদ-সনদ সহীহ]

৩. ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাড়তে লাগল:

আরবের বিভিন্ন গোত্র প্রধানরা কেউ ঈমান এনে আর কেউ অপদস্ত ও হিংসা নিয়ে নবী [ﷺ]-এর কাছে প্রতিনিধি হিসাবে আসতে লাগল। কোন এক দিন আরবদের এক গোত্র প্রধান যার হাতে ছিল তার গোত্রের রাজত্ব ও শক্তি। সে হলো 'আমের ইবনে তুফাইল বড় অহঙ্কারী ও দাম্ভিক। মানুষ চারিদিকে ইসলামের প্রসার দেখে তাকে তার জাতি বলত: ইসলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু সে বলত: আমি কসম করলাম যে, যতক্ষণ আরবদের রাজা না হব এবং তারা আমার পিছনে পিছনে অনুসরণ না করবে ততক্ষণ মরব না। আমি কি কুরাইশদের ঐ যুবকটির পিছনে অনুসরণ করব?

যখন সে দেখল ইসলাম শক্তিশালী, মানুষ মুহাম্মদ [ﷺ]-এর অনুগত হচ্ছে তখন তার জাতির কিছু লোকের সঙ্গে মদিনায় নবীর নিকটে পৌঁছে। নবী [ﷺ] তাঁর সাহাবাদের সাথে ছিলেন। সে নবী [ﷺ]কে বলেন: আমার সাথে একাকী হন আমি কিছু কথা বলতে চাই। ওদিকে সে আরবাদ নামক এক ব্যক্তিকে ঠিক করে

রেখেছিল: যখন আমি মুহাম্মদের সঙ্গে একাকী হব এবং তাকে ব্যস্ত করে ফেলব তখন তুমি তরবারি দ্বারা তাকে হত্যা করবে।

নবী [ﷺ] তার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলে আরবাদ তার তরবারি কোষ মুক্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং তার হাতের শক্তি খর্ব হয়ে পড়ে। আরবাদকে ও যা ইঙ্গিত করছে তা দেখে নবী [ﷺ] 'আমেরকে বলেন: ইসলাম গ্রহণ কর। সে বলল: ইসলাম গ্রহণ করলে আমাকে কি দিবেন? তিনি বললেন: অন্যান্য মুসলমানদের জন্য যা এবং তাদের উপরে যা যা তাই তোমার জন্য। সে বলল: ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার পরে আমার জন্য রাজত্ব নির্দিষ্ট করে দিবেন? তিনি বললেন: না, তোমার জন্য আর না তোমার জাতির জন্য। সে বলল: ইসলাম গ্রহণ করব এ শর্তে যে, গ্রাম্যঞ্চল আমার আর শহর অঞ্চল আপনার। তিনি বললেন: না।

এ সময় 'আমের রাগান্বিত হয়ে চিল্লিয়ে বলল: আল্লাহর কসম হে মুহাম্মদ! তোমার বিরুদ্ধে অশ্ববাহিনী এবং যুবকদের দ্বারা ভরে দিব। আর প্রতিটি খেজুর গাছে একটি করে ঘোড়া বাঁধব এবং গাতফান গ্রোত্রের এক হাজার শক্তিশালী পুরুষ ও এক হাজার নারী দ্বারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে গেল এবং নবী [ﷺ] আকাশের পানে চেয়ে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ 'আমেরের অনিষ্ট থেকে বাঁচাও এবং তার জাতিকে হেদায়েত দান করুন।

সে তার সঙ্গীদের সাথে বের হয়ে মদিনার বাইরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তার জাতির এক মহিলা যার নাম সালুলিয়্যা তার তাঁবুতে ঘুমায়। এদিকে তার গলার মধ্যে গ্ল্যান্ড হয়ে হলকুম ফুলে উঠে। এতে সে ঘাবড়ে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠে বসে বিকটভাবে

চিৎকার করে ঘুরতে শুরু করে ও ঘোড়া থেকে পড়ে সেখানেই মারা যায়। সাথীরা তাকে সেখানে রেখেই ফিরে আসে।

সাথীরা পৌঁছলে সবাই আরবাদকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল: না এমন কিছু হয়নি। তবে মুহাম্মদ এক আল্লাহর এবাদতের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। যদি সে এখন আমার কাছে হত, তাহলে তাকে হত্যা করতাম। এ কথা বলার এক দুই দিন পরে আরবাদ তার উট বিক্রি করার জন্য বের হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ও তার উটটিকে বজ্রাঘাত দ্বারা ধ্বংস করে দেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা 'আমের ও আরবাদের অবস্থার উপর নাজিল করেন সূরা রা'দের ১০-১৩ আয়াত।

[তারীখুল রসুল ওয়াল মুলুক:২/ ৯১]
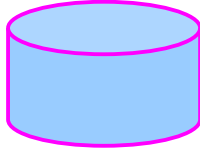
মুহাম্মদ [ﷺ] বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে

(১) হিন্দু ধর্মগ্রন্থেঃ

(ক) বেদসমূহে তাঁর পরিচয়ঃ

হিন্দু ধর্ম এক অতী প্রাচীন ধর্ম যা ইহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্মেরও পূর্বের। হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বপ্রথম ধর্মীয় গ্রন্থ হলো "বেদ"। আর বেদ হলো চারটিঃ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। চতুর্বেদে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে অথর্ববেদে বিস্তারিত। এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ উক্ত বেদের মন্ত্রের কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

অথর্ববেদের ২০তম কাণ্ড, নবম অনুবাক, একত্রিংশ সূক্ত, ৪৭২ পৃষ্ঠার প্রথম মন্ত্রে রয়েছেঃ

"ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রানবতিংচ কৌরম আরুশমেষু দন্মহে"

অর্থঃ হে মানবমণ্ডলী! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন! 'নরাশন্স' এর প্রশংসা করা হবে। আমি এই মুহাজির (দেশ ত্যাগকারী) বা প্রশান্তির ঝাণ্ডাবাহীকে ৬০হাজার শত্রুর মাঝে সুরক্ষিত রাখবো।

এখানে "নরাশন্স" শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যা মূলত দু'টি শব্দ মিলে গঠিত। "নর" যার অর্থ হলোঃ মানুষ আর "আশন্স" যার অর্থ হলোঃ এমন ব্যক্তি যাঁর বেশি বেশি প্রশংসা করা হয়।

সুতরাং "নরাশন্স" এর হুবহু আরবি শব্দ "মুহাম্মাদ"। শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, "নরাশন্স" সংস্কৃত শব্দ আর "মুহাম্মাদ" আরবি শব্দ।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে "নরাশন্স"কে "কৌরাম" বলা হয়েছে। "কৌরাম" শব্দের দু'টি অর্থঃ ১ম মুহাজির বা জন্মভূমি ত্যাগকারী এবং ২য়ঃ শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী। এই দুইটি অর্থই আল্লাহর প্রেরীত শেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ব্যাপারে সর্বাধিক প্রযোজ্য। কারণ, তিনিই জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী ছিলেন। আর এর প্রমাণ ইসলামের সঠিক ইতিহাস। ইহা শুধু মুসলিমরা নয় বরং বহু অমুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকরাও অকপটে স্বীকার করেছেন।

উক্ত বেদের সপ্তম মন্ত্রে রয়েছেঃ

"রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোহমর্ত্যাঁ অতি। বৈশ্বানরস্য সুষ্ঠুতিমা সুনোতা পরিক্ষিত"

অর্থঃ তিনি তো পৃথিবী সম্রাট ও দেবতা, সর্বোত্তম মানুষ, সমস্ত মনবতার দিশারী, সকল জাতির নিকট সুপরিচিত ও তাঁর সর্বোচ্চ প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা কর।

এই মন্ত্রটিও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বিশেষ কিছু গুণাবলী সংশ্লিষ্ট যা পৃথিবীর কোন মহা পুরুষের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

অথর্ববেদের ২০তম কাণ্ডের নবম অনুবাক, ৩১তম সুক্তের ১৪ মন্ত্রের ১ম ও সপ্তম মন্ত্র থেকে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হলো। উক্ত বেদের অবশিষ্ট ১২ মন্ত্রে ও ঋকবেদে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

সুপ্রিয় আগ্রহী পাঠক! বিস্তারিত জানার জন্য অথর্ববেদের ৪৭২ পৃঃ থেকে ৪৭৩ পৃঃ পর্যন্ত পাঠ করুন।

উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলোঃ

- মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে "রবীহ" বলা হয়েছে, যার আরবি হুবহু শব্দ "আহমাদ" অর্থাৎ অতি প্রশংসাকারী। এই নাম কুরআন কারীমের সূরা হাশরের ৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।
- তিনি অতি সুদর্শন হবেন। আর ইহা তাঁর সীরাতে (জীবনীতে) সকলেই উল্লেখ করেছেন।
- মহাপথ প্রদর্শক, পূত-পবিত্র, বার্তাবাহক, সর্বশ্রেষ্ট মানব এবং পৃথিবীর সরদার ও নেতা হবেন। তাঁর পয়গাম্বরী সমস্ত মানবতার জন্য। এ ছাড়া তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।
- মহান আল্লাহ তাঁকে গায়েব তথা অদৃশ্যের খবর জানাবেন এবং তিনি তা মানুষদেরকে বলে দিবেন।
- তাঁর বাহন হবে উট। নি:সন্দেহে তাঁর বাহন ছিল উট এতে কারো দ্বিমত নেই।
- তাঁর ১২জন স্ত্রী হবে। নবী-রসূল, ঋষি ও পুরোহিতদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ১২জন স্ত্রী ছিল। যার প্রমাণ ইসলামের নিরভর্যোগ্য সঠিক ইতিহাস।
- তিনি নাস্তিক, জালেম ও পাপীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর ইহা তাঁর জীবনে ঘটেছেও বটে।
- তাঁর সাথীগণ অতি প্রশংসাকারী ও নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী হবেন, এমনকি যুদ্ধরত অবস্থাতেও। এ নজীর মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথীগণ ব্যতীত আর কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি।
- তাঁর সাথীদের দারা-পরিবার যুদ্ধাবস্থায় নিরাপদে থাকবে। ইহা বাস্তবে ঘটেও ছিল।

- Ø কা'বা ঘর নির্মাণের সময় তাঁর বড় কৌশল প্রকাশ পাবে। যার ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণ দারুন আনন্দিত হবে। ইহা একমাত্র তাঁরই জীবনে ঘটেছিল যার প্রমাণ ইসলামী ইতিহাস।
- Ø সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করবেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সকলে খুশী হবে। ইহা মক্কা বিজয়ের পর বাস্তবায়ন হয়েছিল যা সবার জানা।
- Ø তিনি অনাথের আশ্রয় স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণা বেক্ষণকারী হবেন। আর হাজার হাজার মানুষকে দান-খয়রাত করবেন। এ ছাড়া তাঁর যুগে লোকেরা সবাই শান্তি লাভ করবে। ইহাও বাস্তবে ঘটেছিল।

(খ) পুরাণে পূর্বাভাসঃ

"পুরাণ" হিন্দু ধর্মের এক প্রসিদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ। পুরাণ মোট ১৮টি বলা হয় তার মধ্যে "ভুশিয়া পুরাণ" অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পুরাণ। পুরাণে "কল্কী অবতার" (বার্তাবাহক)-এর আগমনের পূর্বাভাস স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

Ø কল্কী অবতারের পিতা-মাতার নামঃ

কল্কী পুরাণ গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের ১১তম শ্লোকে রয়েছেঃ "সুমতী বিষ্ণুযশাসা গর্ভামা বিষ্ণুওয়ামু"

অর্থাৎ: কল্কী অবতার "সূমতী" এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন আর তার পিতার নাম হবে বিষ্ণুযশা।

''সূমতী''-এর আরবী শব্দ 'আমেনা' আর ''বিষ্ণুযশা''-এর আরবী শব্দ 'আব্দুল্লাহ'। আর বিশ্ববাসী সবাই জানে যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মায়ের নাম ছিল আমেনা আর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। শীমাদ্ভাগবতের পুরাণের প্রথম

স্কন্ধের ৫পৃষ্ঠায় রয়েছে “জগৎ পালক শীভগবান কল্কী নামধারণ করে বিষ্ণুযশা। নামক ব্রাণের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হবেন।

Ø জন্মস্থান ও বংশধরঃ

শীমাদ্ভাগবতের পুরাণের ১২তম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ের ১৮তম শ্লোকে এবং কল্কী পুরাণের ২য় অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে শ্রেণীমত ৮০২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ সেই ভগবান কল্কী শাম্ভল গ্রামের প্রধান বিপ্র মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন। আর আব্দুল্লাহর ঔরসে মক্কায় তাঁর জন্ম হয় এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

Ø কল্কী অবতারের আবির্ভাব কালঃ

অথর্ববেদের ২০তম কাণ্ড নবম অনুবাক ৩১সুক্তের ২য় মন্ত্রের ৪৭২-৮০৩ পৃষ্ঠায় তার বাহন যে উট হবে তা উল্লেখ হয়েছে। তেমনি কল্কী পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে যে, “কল্কী অবতার ঘোড়া ও উটে আরোহণ করবেন এবং তার নিকট তরবারি থাকবে, যার দ্বারা তিনি ধর্মের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।” নিঃসন্দেহে এসব মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

Ø কল্কী অবতারের পিতা-মাতার মৃত্যুঃ

শ্রীমদ্ভগত পুরাণের ১২তম স্কন্ধে বর্ণিত রয়েছেঃ “কল্কী অবতারের পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবেন আর তাঁর জন্মের কিছু কাল পরেই তাঁর মাতাও মৃত্যুবরণ করবেন।” এ কথা চির সত্য যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বে এবং তাঁর মাতা জন্মের ৫/৬ বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। এর জলন্ত প্রমাণ ইসলামের ইতিহাস।

Ø তাঁর মাধ্যমে পয়গম্বরীর সমাপ্তিঃ

কল্কী অবতারের মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর ও বার্তাবাহক আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হবে। শ্রীমদ্ভগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৫তম শ্লোকে বর্ণিত: "বড় বড় পয়গাম্বর ২৪জন এরমধ্যে কল্কী অবতার সর্বশেষ পয়গাম্বর হবেন। তিনি সমস্ত পয়গাম্বরের পরিসমাপ্তকারী হবেন।

Ø কল্কী অবতার সর্বোত্তম আদর্শ ও বৈশিষ্টের অধিকারী হবেনঃ

শ্রীমদ্ভগত পুরাণের ১২তম স্কন্ধের ২য় অধ্যায় ৮০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "জগৎপতি যিনি অষ্টস্বর্গিয় গুণে গুণান্বিত হবেন। তিনি একটি উড়াল দেয়া দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করে আসবেন এবং জমিনে বিচরণ করে রাজা বেশধারী দস্যুগণকে তিনি তরবারি দ্বারা দমন করবেন। ঐ আটটি গুণের বর্ণনা "মহাভারত" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো:

১. **প্রজ্ঞাঃ** অদৃশ্যের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার খবর দেয়া।
২. **কুলীনতাঃ** উচ্চ বংশীয় হওয়া।
৩. **ইন্দ্রিয় দমনঃ** স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখার ক্ষমতা।
৪. **রশুতিজ্ঞানঃ** অহি তথা ঐশীবাণী ও পয়গাম্বরী লাভ।
৫. **প্রাক্রমঃ** শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হওয়া।
৬. **ভুভাশিতাঃ** মিতভাষী হওয়া।
৭. **দানঃ** বদান্যতা।
৮. **কৃতজ্ঞতাঃ** কৃতজ্ঞহৃদয়।

উল্লেখিত আটটি স্বর্গীয় মহৎগুণ হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস মতে কল্কী অবতারের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেগুলো নি:সন্দেহে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে হুবহু মিলে যায়।

(২) তাওরাতেঃ

১. আতা ইবনে ইয়াসের (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আস [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাত করে বলিঃ তাওরাতে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করান। তিনি বলেনঃ ঠিক আছে, আল্লাহর শপথ! কুরআনে বর্ণিত তাঁর [ﷺ] কিছু গুণ তাওরাতেও তিনি ভূষিত। তাওরাতে আছেঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং নিরক্ষরদের জন্য সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করব। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি ‘মুতাওয়াক্কিল’ তথা ভরসাকারী। আপনি না অভদ্র, না নির্দয় এবং না বাজারে হৈচৈকারী। আর তিনি মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দিবেন না বরং ক্ষমা ও মাফ করে দেবেন। আমি তাঁর দ্বারা বক্র জাতির সংশোধন ও তাদের ‘লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ’ না পড়া পর্যন্ত তাঁকে উঠিয়ে নেব না। আমি তাঁর দ্বারা অন্ধদের চক্ষু ও বধিরদের কান এবং আচ্ছাদিত অন্তর খোলাব। [বুখারী]

২. প্রফেসর আব্দুল আহাদ (ইহুদি থেকে মুসলমান) তাঁর পুস্তক “মুহাম্মদ ধর্মীয় গ্রন্থে” বলেনঃ

" I just give the following quotation on the very words of the Revised Version as published by the British and Foreign Bible Society.

We read the following words in the Book of Deuteronomy chapter xviii. verse 18: " I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee; and I will put my words in his mouth"

(ক) "আমি আপনাদের নিকট 'ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সংস্থা' কর্তৃক প্রকাশিত কপি থেকে নিম্নের শব্দগুলো উল্লেখ করব। আমরা তাওরাতের "সিফরুস তাছনিয়ার" chapter xviii. verse 18: তে নিম্নের শব্দগুলো পড়ি। "আমি তাদের জন্য আপনার ন্যায় তাদের ভাইদের মাঝ হতে একজন নবী প্রেরণ করব। আর আমার বাণী তার মুখে রাখব।"

এ শব্দগুলো যদি মুহাম্মদ [ﷺ]-এর জন্য প্রযোজ্য না হয়, তাহলে অবাস্তব হয়ে থাকবে। কারণ, ঈসা [عليه السلام] ইঙ্গিতকৃত যে তিনি ঐ নবী বলে কখনো দাবী করেননি। আর তাঁর অনুসারীরাও একই মতের উপর ছিলেন। কারণ, তারা ঈসার [عليه السلام]-এর দ্বিতীয়বার আগমনের অপেক্ষায় আছেন।

তিনি আরো বলেন:

the Words in the Book of Deuteronomy, chapter xxxiii. verse 2, run as follows: "the Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints; from his right hand went a fiery law for them."

(খ) তাওরাতের (chapter xxxiii. verse 2,) উল্লেখিত শব্দগুলো এরূপ:"প্রভু সীনা থেকে আসেন এবং সা'ঈর হতে তাদের জন্য উজ্জ্বল করেন। আর পারান পাহাড় হতে দু:সাহসী ঝলকিবে। আর তাঁর সাথে দশ হাজার মুমিন আসবে। তাঁর ডান হাত হতে আগুন প্রকাশ পাবে যা তাদের জন্য শরীয়ত হবে।

এ কথাগুলো মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছাড়া আর কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়। বনি ইসরাঈলের এমনকি ঈসাসহ [عليه السلام] কারো পারান তথা মক্কার পাহাড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

(৩) ইঞ্জিলেঃ

Jesus [ﷺ] said: "God shall take me up from the earth, and shall change the appearance of the traitor so that every one shall believe him to be me; nevertheless when he dieth an evil death, I shall abide in that dishonor for a long time in the world. But when Mohammed shall come, the sacred messenger of God, that infamy shall be taken away." (the Gospel of Barnabas, Chap:er 112)

(ক) ঈসা [ﷺ] বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে জমিন থেকে উঠিয়ে নিবেন। আর বিশ্বাসঘাতকের আকৃতি পরিবর্তন করে দিবেন। এমনকি সবাই মনে করবে সেই আমিই। সে চরম জঘন্য অবস্থায় মারা যাবে। এরপর আমি দীর্ঘ সময় অপবাদ নিয়েই অপেক্ষা করব। কিন্তু যখন পবিত্র রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] আসবেন তখন তিনি আমার থেকে এই অপবাদ দূর করবেন।[১]

He further said: "Adam, having sprung up upon his feet saw in the air a writing that shone like the sun, which said: "there is only one God, and Mohammed is the messenger of God." then with fatheely affection the firs: man kissed those words, and rubben his eyes and said: " Blessed be that day when thou shalt come of the world." (the Gospel of Barnabas, Chapter 39)

[১]. ইসলাম সম্পর্কে তারা কি বলেছে বই হতে-ডঃ এমাদুদ্দীন খলীল-পৃঃ৯৩

(খ) আদম [ﷺ] যখন তাঁর দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন দেখলেন হাওয়াতে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল লেখা: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাাহ" তিনি প্রথম মানুষ বাবার ভালবাসা দ্বারা ঐ শব্দগুলোকে চুমা দিলেন এবং দুই চোখে বুলালেন। আর বললেন: সেই দিন বরকতপূর্ণ হোক যে দিন তুমি এ পৃথিবীতে আগমন করবে।"[১]
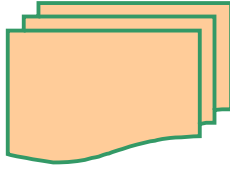
[১]. মুহাম্মদকে পেয়েছি এবং ঈসাকেও হারাইনি বই থেকে- ডঃ আব্দুল মু'তী দালাতী

মুহাম্মদ [ﷺ] বিভিন্ন চিন্তাবীদ, মনীষী ও গবেষকদের দৃষ্টিতে:

the German Poet, Wolfgang Goethe said:`I looked into history for a human paradigm and found it in Muhammad [ﷺ].'

(১) "জার্মানী কবি Wolfgang Goethe বলেন:"একজন মানুষের উত্তম উদাহরণ সন্ধানে আমি ইতিহাস গবেষণা করে শুধুমাত্র আরাবি নবী মুহাম্মদের মাঝেই পেয়েছি।"[১]

Professor Keith Moore,[2] said in his book:" the Developing Human" tIt is clear to me that these statements must have come to Muhammad [ﷺ] from God ,...................."

(২) প্রভেসর Keith Moore তাঁর the Developing Human পুস্তকে বলেন:"কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। কারণ, কুরআনে ভ্রুণের যে সূক্ষ্ম গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে তা সপ্তম শতাব্দির বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জানা অসম্ভব। তাই বিবেকসম্মত একমাত্র ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এসব বর্ণনা মুহাম্মদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকেই অহি হয়েছে।"

---

১. মুহাম্মাদ ফিল আ-দাব আল-'ইলমিয়্যা আল-মুনসিফা/ মুহাম্মাদ উছমান উছমান পৃ:২০

২. তিনি ক্যানাডার Toronto বিশ্ব বিদ্যালয়ের পোষ্টমার্টন ও ভ্রুণ বিষয়ের প্রফেসর। রাবিহতু মুহাম্মাদান ওয়া লাম আখসার ঈসা/ ড:আব্দুল মু'তী দালাতীর বই থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

Dr. Maurice Bucaille, said in his book: "The Qur'an, and Modern Science": A totally objective examination of it [the Qur'an] in the light of modern knowledge, ..."

(৩) "ডঃ মরিস বুকাইল তাঁর "কুরআন এন্ড মর্ডান সাইন্স" পুস্তকে বলেনঃ কুরআনের যে কোন বিষয়ের রিপোর্ট আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে মিল রয়েছে। ইহা আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআনের মাঝে ঐক্যমত পপাষণ করতে বাধ্য করে। বিভিন্ন উপলক্ষে বারবার প্রমাণিত আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, সে সময়ের মুহাম্মদের মত একজন মানুষের জন্য এ ধরণের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, সে সময় এরূপ জ্ঞানের বিস্তার ঘটেনি। আর এধরণের কুরআনিক শিক্ষা তাঁর এক অনন্য স্থান দান করে দেয়।

(৪) ব্রিটিশ নাগরিক বারনার্ড শো তার বই "মুহাম্মদ" (বইটি ব্রিটিশ সরকার পুড়িয়ে ফেলে) এ বলেনঃ

(ক) বিশ্ব এখন মুহাম্মদের চিন্তা-চেতার একজন মানুষের মুখাপেক্ষী। এই নবী যিনি তাঁর দ্বীনকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থানে রেখেছেন। এ দ্বীনটি সমস্ত নাগরিককে হজম করার মত একটি শক্তিশালী চিরস্থায়ী সর্বকালের দ্বীন। আমি আমার জাতির অনেক সন্তানকে সুস্পষ্টভাবে এ দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখছি। আর অদূর ভবিষ্যতে এ দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বিশাল স্থান দখল করে নেবে।

তিনি আরো বলেনঃ

(খ) মধ্যযুগের ধর্মীয় লোকেরা অজ্ঞতা অথবা গোঁড়ামি-বিরোধিতা করে মুহাম্মদের দ্বীনের এক কালো-অস্পষ্ট রূপ দান

করেছে। আর তাঁকে একজন খ্রীষ্টান বিদ্বেষী বলে গণনা করেছে। কিন্তু আমি এ ব্যক্তির ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি, তা বড় আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক। আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তিনি খ্রীষ্টানদের শত্রু ছিলেন না। বরং কর্তব্য হলো: তাঁকে একজন মনুষ্যত্বের উদ্ধারকারী বলে আখ্যায়িত করা। আমার মতে যদি আজ তিনি পৃথিবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাহলে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে সামর্থ্যবান হতেন। যাতে থাকত নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি যার জন্য আজ সারা বিশ্বের মানুষ বিলাপ করছে।

তিনি তাঁর "একশ বছর পরের ইসলাম" বইতে আরো বলেন:

(গ) সমস্ত পৃথিবী একদিন ইসলামকে গ্রহণ করবে। প্রকাশ্য নামে কবুল না করলেও কৃত্রিম ও রূপক নামে কবুল করবে। আর অদূর ভবিষ্যতে একদিন আসবে, যেদিন পাশ্চাত্য দেশগুলো ইসলামকে আলিঙ্গন করবে। পশ্চিমাদের উপর বহু শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে গেছে, তারা এ পর্যন্ত শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যার সিন্ধুর বই-পত্রই পড়েছে। আমি মুহাম্মদ [ﷺ] সম্পর্কে এক খানা বই লিখেছি কিন্তু ইংরেজদের গতানুগতিক রীতির বিপরীত হওয়ার ফলে হৈচৈ ও হাঙ্গামা করে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে।

(৫) ব্রিটিশ দার্শনিক [নবেল পুরস্কৃত] তুমাস কারলীল তাঁর বই **"বীর পুরুষ"** এ বলেন: এ যুগের কোন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় দোষ হলো যে, দ্বীন ইসলাম মিথ্যা ও মুহাম্মদ [ﷺ] ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুক এ ধরণের কথা শুনা। আমার প্রতি জরুরি হচ্ছে এ ধরণের অপমানজনক মিথ্যা দুর্বল প্রচারিত কথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। নিশ্চয় যে রিসালাত সেই রসূল [ﷺ] মানুষের নিকট পৌঁছে

দিয়েছেন তা আজ ১২শত বছর ধরে দুই শত মিলিয়ন মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল প্রদিপের ন্যায় প্রজ্জ্বলীত। এত বড় সংখ্যার মানুষ যারা এ রিসালাতের উপর জীবন অতিবাহিত করেছে তাঁদের কেউ ভাবল না যে ইহা মিথ্যা ও ধোকা?

(৬) ইন্ডিয়ান দার্শনিক রামা কৃষ্ণা বলেন: যখন মুহাম্মদের অবির্ভাব ঘটে তখন আরব উপদ্বীপের উল্লেখযোগ্য কোন নামই ছিল না। এ মরুভূমি যার কোন উল্লেখ ছিল না সেখান থেকেই মুহাম্মদ তাঁর বিশাল আত্মা দ্বারা এক নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর নতুন এক জীবন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ বপণ করেছেন এবং এমন এক রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা মরোক্ক থেকে হিন্দ উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর তিনি তিনটি মহাদেশের চিন্তা-চেতনা ও জীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। মহাদেশগুলো হচ্ছে: এশিয়া, আফ্রীকা ও ইউরোপ।

(৭) প্রাচ্যবিদ ক্যানাডীয়ান মি: জুওয়াইমের বলেন: নি:সন্দেহে মুহাম্মদ একজন ধর্মীয় মহান নেতা। তাঁর ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য যে, তিনি একজন শক্তিশালী সংস্কারক, সুসাহিত্যিক মিষ্টভাষী, দু:সাহসী ও মহৎ চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে এর বিপরীত কিছু গুণের সম্বোধন করা কখনোও ঠিক হবে না। কারণ, যে কুরআন তিনি নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর সীরাত (জীবনী) এ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

(৮) ব্রিটিশ সেয়র ওয়ালয়াম মোয়র বলেন:

(ক) মুহাম্মদ মুসলমানদের নবী। যিনি উত্তম চরিত্র ও সুন্দর অচরণের জন্য ছোটকালে তাঁর দেশের সকলের মতে আল-আমীন (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত হন। কোন গুণগ্রাহী মুহাম্মদের প্রশংসা

করে শেষ করতে পারবে না। আর যে তাঁকে জানে না সে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে না। আর তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তি যিনি তাঁর মহান ইতিহাসে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। সেই ইতিহাস যা মুহাম্মদ রসূলগণের সামনের সারিতে ও মহাবিশ্বের চিন্তাবিদদের জন্য রেখে গেছেন।

তিনি আরো বলেনঃ

(খ) মুহাম্মদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর দ্বীন ছিল অতি সহজ। তিনি এমন সব কার্যাদি আঞ্জাম দিয়েছেন, যা বিবেককে বিস্ময় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করতে এবং উত্তম চরিত্রকে পুনর্জীবন ও মর্যাদার ব্যাপারকে উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত ইতিহাস ইসলামের নবী মুহাম্মদের ন্যায় এমন একজন সংস্কারকের সাক্ষ্য দিতে পারে নাই।

(৯) অষ্ট্রীয় শিবরাক বলেনঃ মুহাম্মদের মত একজন মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা মনুষ্য জাতীর জন্য এক গৌরব। কারণ, তিনি একজন নিরক্ষর মানুষ হয়ে আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে এক পরিপূর্ণ বিধান নিয়ে এসেছেন। আমরা ইউরোপীয়ানরা যদি সে বিধানের শীর্ষস্থানে পৌঁছি তবে সবচেয়ে বেশি সুখী হব।

(১০) জরজ ডি টুওলাজ তাঁর **"জীবন"** নামক পুস্তকে বলেনঃ মুহাম্মদের নবুয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান করা আল্লাহর সে শক্তির ব্যাপারে সন্দেহ করা যা সমস্ত মখলুককে শামিল করে।[১]

[১]. রাবিহতু মুহাম্মাদ ওয়া লাম আখসার ঈসা/ আব্দুল মু'তী আদ-দালাতী বই থেকে।

(১১) মহাপণ্ডিত মিঃ ওয়ালজ তার বই **"সত্য নবী"** এ বলেনঃ সত্য নবী হওয়ার উজ্জ্বল দলিল হচ্ছেঃ তাঁর পরিবার ও নিকটম আত্মীয়-স্বজনরা সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাঁর সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে ছিল অধিক জ্ঞাত। যদি তারা তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ করত, তাহলে কখনোও তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনত না।[১]

(১২) মধ্যপ্রাচ্যবিদ হেইল তার বই **"আরব সভ্যতা"** এ বলেনঃ মানুষ ইতিহাসে এমন কোন ধর্ম জানি না, যা এত দ্রুত প্রসার লাভ এবং সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করেছে যেমনটি করেছে ইসলাম। মুহাম্মদ বাস্তবে একটি জাতির অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন এবং জমিনে আল্লাহর এবাদত করার সুব্যবস্থা করেছেন।

আর ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক সাম্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি এমন একটি জাতির মাঝে নিয়ম, নীতিমালা, সুদৃঢ় সম্পর্ক, আনুগত্য ও ইজ্জত-সম্মান প্রতিষ্ঠা করেন যারা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই জানত না।

(১৩) স্পেনীয় মধ্যপ্রাচ্যবিদ জান লীক তার বই **"আল-আরব"** এ বলেনঃ মুহাম্মদের জীবনকে আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা যেরূপ ভূষিত করেছেন তারচেয়ে বেশি বর্ণনা করা অসম্ভব। আল্লাহর বাণীঃ

"আমি আপনাকে বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত (শান্তির দূত) স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়াঃ১০৭]

---

[১]. পূর্বের রেফারেন্স।

মুহাম্মদ প্রকৃতভাবে একজন রহমত স্বরূপ ছিলেন। আমি তাঁর প্রতি আফসোস ও আকৃষ্ট সহকারে দরুদ পাঠ করি।[১]

(১৪) ওয়াল দেওরান্ট তার বই **"সভ্যতার কেসসা"** ভলিয়াম:**১১** তে বলেন: যখন আমরা কোন নেতার প্রভাব মানুষের প্রতি পড়ার ব্যাপারে ফয়সালা করি তখন বলা উচিত: মুসলমানদের রসূল হলেন ইতিহাসের বড় বড় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান। তিনি সমস্ত গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের খামখিয়ালিকে বিলুপ্ত করে ইহুদি, খ্রীষ্টান ও তাঁর দেশের পুরাতন ধর্মকে খতম করেন।

(১৫) মাইকেল হার্ট তার **"১০০ চিরস্মরণীয় ব্যক্তি"** পুস্তকে বলেন: তালিকায় সর্বপ্রথম মুহাম্মদকে নির্বাচন করেছি। আর ইহা অনেকের নিকটে আশ্চর্যের ব্যাপার হওয়াটায় স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় মুহাম্মদ এমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ মানুষ, যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার সব বিষয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তি। ------- আজ প্রায় মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৩ শতাব্দি পরেও তাঁর প্রভাব শক্ত ও আধুনিকভাবে সর্বদা বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। -------- মুহাম্মদ মানুষের অন্তরের গভীরে শক্তভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। [২]

---

[১]. পূর্বের রেফারেন্স।

[২]. ১০০ জন চিরস্মরনীয় ব্যক্তি সবয়েছে মহান মুহাম্মদ পৃ:১৩-১৫।

উম্মতের প্রতি প্রিয় হাবীব [ﷺ]-এর অধিকার

আমাদের উপর নবী [ﷺ]-এর হক তথা অধিকার অধিক। একজন মানুষ যতই চেষ্টা ও উৎসর্গ করুক না কেন; তাঁর প্রিয় হাবীবের সমস্ত হক আদায় করা অসম্ভব। তাঁকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ মানব জাতিকে মৃত্যু থেকে জীবিত কেরেছেন। তিনি শির্ক, কুফুরি ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ ও দ্বীন ইসলামের আলোর দিকে এনেছেন।

এ ছাড়া তিনি চিরস্থায়ী আজাব থেকে তাদেরকে নাজাতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। অপদস্ত থেকে সম্মানের শিখরে উন্নীত করেছেন। আর তা ছিল নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর তাওহীদের আহ্বান ও শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে মানব জাতির কল্যাণের জন্য যে বিধিবিধান রেখে গেছেন, তার অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যেই রয়েছে দুই জাহানের পরম সুখ ও শান্তি। উম্মতের প্রতি নবী [ﷺ]-এর হক (অধিকার) অনেক তার মধ্য হতে কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. নবী [ﷺ]-এর প্রতি ঈমান আনা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন।" [সূরা নিসা:৩৬]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

"আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শুধুমাত্র রহমত (দয়া) স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া:১০৭]

২. নবী [ﷺ]কে মহব্বত ও সম্মান করা:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"যাতে করে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান আন। আর তাকে (নবীকে) সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর তসবিহ পাঠ কর।" [সূরা ফাতহ:৯]

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি থেকে অধিক প্রিয় না হব।" [বুখারী]

উমার ফরুক [رضي الله عنه]কে নবী [ﷺ] বলেন:"যতক্ষণ তোমার জীবনের চেয়েও আমাকে বেশি না ভালবাসবে ততক্ষণ (মুমিন হতে পারবে) না।" [বুখারী]

৩. নবী [ﷺ]-এর সুন্নতের একচছত্র আনুগত্য, তাঁর সীরাতের অনুসরণ ও তাঁর উত্তম আদর্শ পালন:

নিজের চলা-ফেরা, পোশাক, পানাহার, ঘুম ইত্যাদিতে তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ঘোষণা করে বলেন:

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। ইহা যারা আল্লাহকে, আখেরাতকে ও আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করে তাদের জন্য।" [সূরা আহজাব:২১]

৪. নবী [ﷺ]-এর বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা ও সন্তুষ্টি চিত্তে তা মেনে নেওয়া:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের।

অতএব, যদি কোন ব্যাপারে বিবাদ হয়, তবে আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস কর। ইহাই হচ্ছে উত্তম ও সুন্দর পরিণতি।" [সূরা নিসা:৫৯]

দায়িত্বশীল বলতে: দ্বীনি হকপন্থী আলেম ও ইসলামি সরকার বাহাদুর ও তাঁর পক্ষের ভারপ্রাপ্ত আমীরগণ। এঁদের বা কোন পীর-মাশায়েখ কিংবা মাজহাব অথবা ইমামের কোন কথা-কাজ বা নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিপরীত হলে তা গ্রহণ করা বা মান্য করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

"আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মাঝের বিবাদের ফয়সালাকারী হিসাবে আপনাকে মেনে না নিবে। অত:পর আপনার বিচারকৃত বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন প্রকার সংকির্ণতা অনুভব করবে না এবং দ্বিধাহিন চিত্তে তা মেনে না নিবে।" [সূরা নিসা:৬৫]

৫. নবী [ﷺ] ও তাঁর সুন্নতের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা:

যারা বিরুদ্ধাচরণ ও অপপ্রচার করে এবং বিভিন্ন ধরণের বিদাত সৃষ্টি করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া। নবীজির সুমহান চরিত্র এবং গুণাবলী প্রকাশ ও প্রচার করা এবং মু'জিযাসমূহ বর্ণনা করা। আর তাঁর ব্যাপারে কি কি করণীয় সে ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা। তাঁর সুন্নতের বহুল প্রচার ও পুনর্জীবিত করা এবং তা দ্বারা আমল করা। আর এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী সালাফে সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

কারণ, তাঁরাই হলেন সুন্নতের সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার ও আমলের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ স্বরূপ।

৬. নবী [ﷺ]-এর প্রতি অধিকহারে দরুদ ও সালাম পাঠ করা:
এর উদ্দেশ্য হবে:

(ক) আল্লাহর নির্দেশ পালন:
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অতএব, হে মুমিনরা তোমরা তার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর।" [সূরা আহজাব:৫৬]

(খ) অধিক সওয়াব অর্জন:

নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।" [মুসলিম]

(গ) দুশ্চিন্তা দূর ও গুনাহ মাফ:

উবাই ইবনে কা'আব [رضي الله عنه] বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরুদ পাঠ করি। সুতরাং, আপনার প্রতি দরুদের জন্য কতটুক সময় নির্দিষ্ট করব? তিনি বললেন: যতটুক চাও। আমি বললাম: এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন: যা চাও, যদি এর অধিক কর, তাহলে তোমার জন্য উত্তম।

আমি বললাম: তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন: যা চাও, কিন্তু যদি এর অধিক কর, তাহলে আরো ভাল। আমি বললাম: তাহলে দুই তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন: যা চাও, তবে এরচেয়ে বেশি করলে আরো তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম: তাহলে আমার (বিশেষ নির্দিষ্ট এবাদতের) সমস্ত সময় আপনার প্রতি দরুদের

জন্য নির্দিষ্ট করে দিব। তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং তোমার পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহীহ সুনানে তিরমিযী]

(ঘ) বখিল হতে বাঁচা:

আলী ইবনে আবি তালিব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তির নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় তার পরে সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে না সে বখিল।" [সহীহ সুনানে তিরমিযী]

৭. নবী [ﷺ]-এর বেশি বেশি প্রশংসা ও গুণগান করা:

মনে রাখতে হবে যে, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করার সময় অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি ও মিথ্যা কিছু বলা যাবে না। আর আল্লাহর কোন গুণ বা হক নবী [ﷺ]কে দেওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর প্রশংসা ক'রে বলেন:"নিশ্চয় তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা নূন: ৪]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"
[সূরা তাওবা: ১২৮]

উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আমাকে নিয়ে প্রশংসায় তোমরা অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনটি অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি করে ছিল খ্রীষ্টানরা মারয়ামের সন্তান ঈসাকে নিয়ে। আমি শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দা ও রসূল। অতএব, তোমরা আমাকে বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।" [বুখারী]

৮. নবী [ﷺ]-এর জন্য আল্লাহর কাছে অসিলা চাওয়াঃ

অসিলা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চস্থান। আজানের দোয়ায় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য আল্লাহর নিকট অসিলা চেয়ে দোয়া করার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। যেমন: ------- আ-তি মুহাম্মদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ----।" [মুসলিম]

৯. নবী [ﷺ]-এর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও তাঁর সঙ্গে আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করাঃ

নবী [ﷺ]কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। আল্লাহর বাণী:"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের শব্দকে নবীর শব্দের উপর উঁচু করবে না। আর তোমাদের আপোসের মাঝে যেভাবে একে অপরের সঙ্গে জোরে কথা বল সেরূপ তার সঙ্গে জোরে কথা বলবে না। যদি কর তাহলে তোমাদের অজান্তে তোমাদের আমলসমূহ বিনিষ্ট হয়ে যাবে।" [সূরা হুজুরাত:২]

নবীজির পরিবারবর্গ ও সাহাবা কেরাম জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে আদব রক্ষা করেছেন তার কিছু নমুনা:

(ক) তাঁরা নবী [ﷺ]কে সম্মান ও ভয় করেছেন। নামাজে ভুল হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। "সেখানে আবু বকর ও উমার [রা:]-এর মত মানুষ ছিলেন। তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় করেন। আর এ ব্যাপার নিয়ে যুলইয়াদাইন সাহাবী কথা বলেন।" [বুখারী]

(খ) আমর ইবনে 'আস [رضي الله عنه] তাঁর মৃত্যুর সময় বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এরচেয়ে আমার নিকট আর কেউ অধিক প্রিয় ছিলেন না এবং আমার চোখে তাঁর চেয়ে কেউ বেশি সম্মানি ছিলেন না। তাঁর সম্মানের কারণে আমি আমার দৃষ্টিভরে কখনো তাঁকে দেখেনি। আমি যদি জিজ্ঞাসিত হই তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা

করতে, তাহলে আমার দ্বারা তা সম্ভব না; কারণ কখনো আমি আমার দৃষ্টিভরে তাঁকে দেখেনি। আমি যদি এ অবস্থায় মারা যাই তাহলে আশা করি আমি জান্নাতবাসী হব।"

(গ) নবীর সঙ্গে আদবের ব্যাপারে সাহাবাদের ভয়-ভীতিঃ

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী [ﷺ] ছাবেত ইবনে কাইস [ﷺ]কে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে একজন মানুষ বললঃ হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! আমি তার ব্যাপারে আপনাকে খবর দিব।

সে ব্যক্তি এসে ছাবেতকে তাঁর বাড়িতে মাথা নিচু করে বসা অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার কি ব্যাপার? ছাবেত বললেনঃ অনিষ্ট ও অমঙ্গল, নবীর শব্দের উপর উঁচু শব্দে সে কথা বলত তাই তার সমস্ত আমল পণ্ড ও বরবাদ হয়েছে এবং সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। লোকটি এসে নবী [ﷺ]কে তাঁর খবরা খবর জানাল। নবী [ﷺ] লোকটিকে বললেনঃ যাও ছাবেতের নিকট গিয়ে বলে আসঃ তুমি জাহান্নামী নও বরং তুমি জান্নাতী।" [বুখারী]

আর তাঁর মৃত্যুর পরে আদব রক্ষা করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্য হতে। যেমনঃ

(ক) নবী [ﷺ]-এর নাম বা তাঁর হাদীস উল্লেখ করার সময় নমনীয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। যেমনঃ

+ মু'আবিয়া [ﷺ] জানতে পারেন যে, কাবেস ইবনে রবী'আ নবী [ﷺ]-এর সাথে তার সদৃশ রয়েছে। কাবেস মু'আবিয়া [ﷺ]-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁর খাট থেকে উঠে গিয়ে তার কপালে চুমা দেন। আর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সদৃশের জন্য তাকে মারওর মিরগাব নামক স্থান দান করেন। [আশশিফা বিতা'রীফি হকুকিল মুস্তফা, কাযী ইয়াযঃ ২/৬১০]

+ ইমাম জা'ফার সাদেক (রহঃ) রসিকতাপ্রিয় ছিলেন। যখন তাঁর নিকট রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নাম উল্লেখ হত তখন তিনি ভয়ে হলুদ হয়ে পড়তেন। আর ওযু ছাড়া কখনো রসূলুল্লাহর [ﷺ]-এর হাদীস বর্ণনা করতেন না। [ঐ ২/৫৯৭]

+ মুহাম্মদ ইবনে মুন্‌কাদের (রহঃ) [আয়েশা (রাঃ)-এর মামা] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাদীস পড়ার সময় কান্নাকে চেপে রাখতে পারতেন না। [সিয়ার আ'লামুননুবালাঃ৫/৩৫৪]

+ হাসান বাসরী (রহঃ) নবী [ﷺ]-এর খেজুরের ডাল পরিত্যাগ করার জন্যে ডালের কান্নার হাদীস বর্ণনা করার সময় ক্রন্দন করতেন। আর বলতেনঃ হে আল্লাহর বান্দারা! একটি শুকনা খড়ি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মহব্বতে আকৃষ্ট হয়েছে। অতএব, তোমাদেরকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য বেশি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। [ঐ ৪/৫৭০]

+ ইমাম মালেক (রহঃ) যখন হাদীস পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন ওযু করে দাঁড়ি আঁচড়িয়ে সম্মান ও ভয়-ভীতি সহকারে বসে এরপর হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে উত্তরে বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাদীসকে মর্যাদা করা পছন্দ করি। [আশশিফা বিতা'রীফি হকুকিল মুস্তফা-কাযী ইয়াযঃ ২/৫৯৯-৬০৪]

(খ) নবী [ﷺ]-এর মসজিদে নববীকে মর্যাদা করা যেমনঃ

সায়েব ইবনে এজিদ [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি ছোট কংকর দ্বারা আঘাত করলেন। ফিরে দেখি তিনি উমার ইবনে খাত্তাব [রাঃ]। তিনি বললেনঃ যাও এই দুইজনকে ধরে নিয়ে

আস। আমি তাদের দুইজনকে হাজির করলাম। উমার [ﷺ] তাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কে বা তোমরা কোথাকার? তারা বলল: আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন: যদি তোমরা মদীনার হতে, তাহলে মেরে তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদে শব্দ উঁচু করতেছ ?!। [বুখারী]

(গ) নবী [ﷺ]-এর কবর শরীফ জিয়ারতের সময় ভয়-ভীতি ও সম্মান প্রদর্শন করা। সেখানে হৈচৈ ও ভিড় না করা এবং কবরকে সামনে করে দোয়া বা দেওয়াল স্পর্শ করে চুমা খাওয়া ইত্যাদি কোন বিদাত কাজ না করা।

১০.নবী [ﷺ]-এর আহলে বাইত (পরিবার)কে ভালবাসা ও তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা:

এ হকটি তিনভাবে আদায় করা যেতে পারে যেমন:

(ক) তাঁদেরকে ভালবাসার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ পালন। আল্লাহর বাণী:"বলুন, আমি আমার দা'ওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ চাই।" [সূরা শূরা: ২৩]

(খ) নবী [ﷺ]-এর আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়ন এবং এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ পালন। জায়েদ ইবনে আরকামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ------ আমি তোমাদের জন্য দুইট জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো: আল্লাহর কিতাব, এতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো। অতএব, আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধর। তিনি কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। অত:পর তিনি বলেন: আর আমার পরিবারবর্গ।

আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের

ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।” (এভাবে তিনবার বলেন) [মুসলিম]

(গ) তাঁদেরকে ভালবাসার ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর পরিবার, সাহাবা কেরাম ও তাঁদের পরের ইমামগণের অনুসরণ করা। আবু বকর [رضي الله عنه] বলতেন: তোমরা নবী [ﷺ]-এর পরিবারবর্গের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা কর। [বুখারী]

+ ইমাম শা‘বী (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জায়েদ ইবনে সাবেত [رضي الله عنه] তাঁর মায়ের জানাযার নামাজ পড়েন। অত:পর আরোহণের জন্য তাঁর খচ্চর হাজির করা হয়। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] বাহনকে ধরে ফেলেন। জায়েদ [رضي الله عنه] বলেন: ছেড়ে দিন হে রসূলের চাচার ছেলে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] বলেন: আলেমদের সঙ্গে আমরা এরূপ ব্যবহার করি। তখন জায়েদ [رضي الله عنه] ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه]-এর হাতে চুমা দিয়ে বলেন: নবীর পরিবারের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করার জন্য আমরা নির্দেশিত। [আশশিফা বিতা‘রীফি হকুকিল মুস্তফা-কাযী ইয়ায: ২/৬০৮]

+ **আহলে বাইতকে ভালবাসা তিনভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে:**

১. নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ পাঠের সময় তাঁদের প্রতিও দরুদ পাঠ করা। আর ইহা দরুদে ইবরাহিমীতে উল্লেখ হয়েছে। [বুখারী]

২. আহলে বাইতকে নবী [ﷺ] বিশেষ কোন জ্ঞান নির্দিষ্ট করেছেন এমন আকীদা পোষণ না করা। আবু জুহাইফা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আলী ইবনে আবি তালিব [رضي الله عنه]কে

জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আপনাদের তথা আহলে বাইতের কাছে বিশেষ কোন কিতাব আছে কি? তিনি বলেন: না, কিন্তু আল্লাহর কিতাব অথবা একজন মুসলিম ব্যক্তিকে দেওয়া বুঝ কিংবা এই সহীফাহ। জুহাইফা বলেন: আমি আবার বললাম: এ সহীফাতে কি আছে? আলী [ﷺ] বললেন: হত্যাকৃত ব্যক্তির দিয়ত (রক্তপণ) এবং যুদ্ধবন্দীর মুক্তিপণ। আর কোন মুসলিম কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না।" [বুখারী]

৩. আহলে বাইত মা'সূম তথা নিষ্পাপ এমন আকীদা না রাখা। বরং তাঁদের দ্বারা পাপ সংঘটি হতে পারে যেমন সাহাবা কেরাম ও অন্যান্যদের দ্বারা গুনাহর কাজ সম্পাদিত হয়।

১১. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণকে মহব্বত করা এবং তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা: কারণ

(ক) তাঁরা নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী এবং সকল মুমিনদের মা। আল্লাহর বাণী: "নবী মুমিনদের নিজেদের জীবনের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।" [সূরা আহজাব:৬] একজন মুমিন তাঁদেরকে মহব্বত করেন। কারণ, নবী [ﷺ] তাঁদেরকে মহব্বত করেন। আর যে তাঁদের মাতৃত্বকে অস্বীকার করবে সে মুমিন না। আর যে ব্যক্তি তাঁর মা জাতির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাঁদের সাথে অসদ্ব্যবহার করতে রাজি না তিনিই মুত্তাকি তথা আল্লাহভীরু।

(খ) তাঁরা উম্মতের জন্য অনেক হাদীস সংরক্ষণ করেছেন। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে তাঁরা ছাড়া আর কেউ অবহিত হতে পারে না। যেমন: যে সকল কার্যাদি নবী [ﷺ] বাড়িতে করতেন।

+ নবী সহধর্মেণীদের ভালবাসার আলামাত দুইটিঃ

১. নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ পড়ার সময় তাঁদের প্রতিও দরুদ পাঠ করা। "আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মদ ওয়া 'আলাা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহ্--------।"

২. তাঁরা সতি-সাধ্বি ও পূত-পবিত্র এই আকীদা রাখা। যে সমস্ত বিষয় তাঁদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে তা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ পবিত্র বিশ্বাস করা।

১২. নবী [ﷺ]-এর সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم]কে মহব্বত করা এবং তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাঃ

তাঁদের কারো নাম উল্লেখ করার সময় 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলা এবং আল্লাহর নিকট তাঁদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। ইহা চারটি কারণেঃ

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণীর অনুসরণ করা। আল্লাহর বাণীঃ "আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা:১০০]

(খ) আরো আল্লাহর বাণীর বাস্তবায়ন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ "আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পলনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের

বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা হাশর:১০]

(গ) সাহাবা কেরাম মুসলমানদের জন্যে নবী [ﷺ] থেকে কুরআন ও সমস্ত সহীহ হাদীস হেফাজত করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আর কুরআন ও হাদীসের অনেক অবিস্তারিত জিনিস ও দ্বীনের আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) সাহাবা কেরাম নবী [ﷺ]কে চরম ভালবেসেছেন এবং তাঁর দ্বীনকে প্রচার ও প্রসার করেছেন। দ্বীনকে উড্ডীন করার জন্য তাঁদের জানমাল দ্বারা জিহাদ করেছেন। নবীর মহব্বতকে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মা-বাবা ভাই-বোন ও স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রা:) তাঁর সমস্ত সম্পদ, প্রভাব ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। আবু বকর [রাঃ] তাঁর সব সম্পদ, প্রভাব ও জীবনকে বাজি রেখে সাহায্য করেছেন। আলী [রাঃ] হিজরতের রাত্রিতে নিজের জীবনকে বাজি রেখে নবী [ﷺ]-এর বিছানায় তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। সাহাবাগণ তাঁদের জীবন দিয়ে তাঁদের প্রিয় হাবীবকে রক্ষা করেছেন।

১৩. নবী [ﷺ]-এর পরিবার ও সাহাবাদের মাঝে বা সাহাবাদের আপোসের মাঝের সংঘটিত সমস্যার ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখা:

আর ইহা তিনটি কারণে:

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমারা জিজ্ঞাসিত হবে না।"
[সূরা বাকারা:১৩৪]

বিবেকবান ও নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তি যা অপ্রয়োজন ও যে ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে না তা থেকে বিরত থাকে।

(খ) তাঁদের মাঝে যাকিছু ঘটেছে সবই ছিল নিজেদের ইজতিহাদ তথা নিজস্ব গবেষণা ও মতামত এবং রাজনৈতিক ব্যাপার। আর গবেষকরা সঠিক ও বেঠিক উভয় অবস্থাতে প্রতিদানপ্রাপ্ত। দয়াময় ও মহান প্রতিপালকের নিকটে তাঁরা চলে গেছেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাঁদেরকে নবীর পরিবার ও সঙ্গী-সাথী হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আর আল্লাহর নির্বাচন নি:সন্দেহে সর্বোত্তম এবং নির্ভুল।

(গ) তাঁরা একে অপরের প্রশংসা করতেন এবং একজন অপরজন থেকে শিক্ষা অর্জন করতেন। আপোসের মাঝে বৈবাহিক সূত্র মজবুত করতেন। মৃত্যুর পরে তাঁদের মাঝের সংঘটিত ব্যাপারে তাঁরা কাউকে বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট করে যাননি।

১৪. আহলে বাইতের কাউকে বা কোন সাহাবাকে গালি-গালাজ বা অভিশাপ না করা:

ইহা গুরুত্বপূর্ণ ৩টি কারণে:

(ক) নবী [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে গালি-গালাজ করতে নিষেধ করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। নবী [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিবে না। কারণ, যদি তোমরা ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ কর তবুও তাঁদের এক মুদ [৬২৫ গ্রাম] এবং তারও অর্ধেক [৩১২.৫ গ্রাম] পরিমাণ খরচের সমান পৌঁছতে পারবে না।" [বুখারী]

আর নবী [ﷺ]-এর পরিবার সকলেই তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) গালি-গালাজ ও অভিশাপ দেওয়া কোন মুমিনের চরিত্র নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় মুমিন না অভিশাপকারী, না অপবাদদানকারী আর না সে অশ্লীল ও নোংরা কথা বলে।" [হাকেম, সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন:১/১২]

এ ছাড়া না ইহা কোন সত্যবাদীর গুণ। আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কোন সিদ্দীক তথা মহা সত্যবাদীর জন্য অভিশাপকারী হওয়া উচিত নয়।" [মুসলিম]

(গ) গালি-গালাজ ও অভিশাপ করা একটি নিন্দনীয় চরিত্র। ইহা না শরীয়ত আর না ইসলামি সমাজের উত্তম প্রচলন বা বিবেক সমর্থন করে। এমনকি কোন জীবজন্তুর প্রতিও জায়েজ না। ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] কোন এক সফরে ছিলেন। আর একজন আনসারী মহিলা একটি উটের উপর ছিল। মহিলাটি উটটির উপর বিরক্ত হয়ে অভিশাপ করে। নবী [ﷺ] ইহা শুনে বলেন: উটটির উপরে যা কিছু আছে তা নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, সে অভিশপ্ত।" [মুসলিম]

যদি কোন জানোয়ারের অবস্থা এ হয়, তাহলে কোন মানুষ ও আহলে বাইত কিংবা সাহাবী অথবা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাদের অভিশাপ সাব্যস্ত না, তাঁদের ব্যাপারে কি হওয়া উচিত? চাই সে কোন মুসলিম হোক বা কোন নির্দিষ্ট কাফের হোক তাকে গালি বা অভিশাপ করা বৈধ নয়।

১৫.নবী [ﷺ]কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদেরকে ঘৃণা এবং শাস্তি প্রদান করা:

এর ৩টি কারণ:

(ক) নিশ্চয় নবী [ﷺ]কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরি এবং যে করবে সে মুরতাদ এবং দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী:"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন, তবে তারা বলবে: আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর বিধানের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দেব। কারণ, তারা ছিল অপরাধী।" [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

(খ) ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করা কোন মুমিন বা বিবেকবান ব্যক্তির চরিত্র নয়। বরং ইহা অজ্ঞ-মূর্খদের চরিত্র। আল্লাহর বাণী: "যখন মূসা (আ:) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন: আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল: আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? মূসা (আ:) বললেন: মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [সূরা বাকারা:৬৭]

(গ) উপহাস করা বিশেষ করে মহান ব্যক্তিদেরকে এক চরম অপরাধ যা নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। চাই ইহা জবান দ্বারা হোক অথবা লিখনি কিংবা কার্যাদি দ্বারা হোক। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী সলেহ [عليه السلام]কে যারা ঠাট্টা করেছিল তাদের ব্যাপারে সত্য সত্যিই বলেছেন:

"যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল।" [সূরা শামস:১২]

নবী [ﷺ] কা'বার পার্শ্বে নামাজরত অবস্থায় আবু জাহল যে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে:"জাতির সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে গিয়ে সে কাজ করল।" [বুখারী]

Ø মহান ব্যক্তিদের ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা এক বিশ্বজনীন ব্যাপার। যেমন: বলা হয়েছে: ফলদার গাছে ঢিল ছুড়া হয় আর যে গাছে ফল নাই সে গাছে কেউ ঢিল ছুড়ে না। মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিরা মানুষের উপহাস থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন না। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালাও যিনি সবকিছু থেকে পূত-পবিত্র। ইহুদিরা আল্লাহ সম্পর্কে বলে:"আর ইহুদিরা বলে: আল্লাহর হাত বন্ধ (দরিদ্র) হয়ে গেছে।" ।] [সূরা মায়েদা: ৬৪]

Ø সমস্ত নবী-রসূলগণকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"অনুরূপ তাদের পূর্বে যেই রসূলই এসেছেন তাকে তারা জাদুকর বা পাগল বলেছে।" [সূরা যারিয়াত:৫২]

Ø নবী-রসূলদেরকে যারা উপহাস করেছে তাদেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি:

¿ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রসূলগণকে বিদ্রুপকারীদের বিভিন্ন ভাবে শাস্তি দান এবং নবী-রসূলগণকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

I k j i h g f e d c b a M

الأنبياء: ٤١ L n m

"আপনার পূর্বেও অনেক রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হয়েছে। অত:পর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে।" [সূরা আম্বিয়া:৪১]

¿ আল্লাহ তা'য়ালা ঠাট্টাবিদ্রুপকারীদের বিভিন্ন আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

; : 9 8 7 6 5 4 2 1 0 [

G F D C B A @ ? > = <

العنكبوت: ٤٠ Z N M L K J I H

"আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি পানিতে নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।" [সূরা আনকাবূত:৪০]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত